বেলা-অবেলার কথা

মাহমুদুল হাছান

উৎসর্গ

আমার মা মোছা. ফজিলা খাতুন
বাবা (মরহুম) আব্দুল হেকিম

বইটির নির্যাস

গ্রামের অজপাড়া গাঁয়ের শালুক-শাপলা কুড়ানো ছোটখাটো গড়নের শ্যামল বর্ণের ডানপিটে এক বালক। দারিদ্র্যের কঠিন কশাঘাতের মাঝে বড় হওয়া ছেলেটি উঠে দাঁড়াতে চায়। সামনে এগিয়ে যেতে চায়। আকাশসমান স্বপ্নের পেছনে ছুটেচলা এক ক্লান্তিহীন তরুণ। প্রেম কখনো কখনো তাঁর জীবনে দ্যুতি ছড়িয়েছে; কিন্তু ধরা দেয়নি। বিবেকহীন সমাজের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিটি স্তরে স্তরে তাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছে। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ কাউকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে এক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই জীবনের গতি খুঁজে পায়। কারো করুণা নিয়ে কিংবা অনর্থক কেঁদে নয়; বরং আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সে তাঁর দিগন্তছোঁয়া লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। ঘুণেধরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজে কীভাবে নানা বাধা অতিক্রম করে, অদম্য মনোবল নিয়ে এগোতে হয়-তারই এক জ্বলন্ত সাক্ষী এই হোঁচট খাওয়া তরুণ। নীরবে নিভৃতে সয়ে যাওয়া কষ্টগুলো মেলে ধরেছে শাপলার পাপড়ির মতো। তাঁর এই নিজস্ব দুঃখগুলো মিশে একাকার হয়ে যায় সমাজের হাজারো বঞ্চিত মেধাবীর হাহাকারের সঙ্গে। শহরের চাকচিক্য ছেড়ে গ্রামের শ্যামল ছায়ার মাটির ঘরে বসে জোছনার আলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে চায়। বেলিফুল আর গোলাপের গন্ধ গায়ে মেখে ঘুমিয়ে থাকতে চায় অনন্তকাল ধরে।

আমার ছেলেবেলা

আষাঢ়-শ্রাবণে আম কুড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, কাঁঠাল-লিচুর মৌ-মৌ গন্ধ নিয়ে বকের পেছনে দৌড়ানো আর বিল-ঝিলে শালুক, শাপলা, হেলেঞ্চা শাক কুড়াতেই কখন যে সন্ধ্যা হয়ে যেত টের পেতাম না। ঠেলাজাল দিয়ে মলা, চেলা, ডেলা আর পুঁটি মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি কিংবা কাদামাটি দিয়ে গড়াগড়ির সুখে মগ্ন থাকতাম। অঝোর বৃষ্টির মাঝে সদ্য কেটে ফেলা ধানখেতে বল খেলতাম। চৈত্র মাসের গগনবিদীর্ণ করা ঠা ঠা রোদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাড়ার ছেলেরা মিলে 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে...' গীত গেয়ে যে ক-মুঠ চাল পেতাম, তা দিয়ে এক পাতিল খিচুড়ি রান্না করে সবাই মিলে যে খেতাম, তার স্বাদ এখনো জিবে লেগে আছে যেন। সিঅ্যান্ডবির খালে সাঁতার কাটা, ডুব দিয়ে একজন আরেক জনকে ছুঁয়ে এপার থেকে ওপারে যাওয়া আর সাবানের পরিবর্তে তিল গাছের পাতা দিয়ে মাথায় ঘষে ফেনা করে গোসল সেরে লাল চোখ নিয়ে বাড়িতে এসে মায়ের বকুনি খাওয়ার মাঝে অন্যরকম সুখ পেতাম।

ঘাসফড়িং আর প্রজাপতির পেছনে অনর্থক দৌড়াদৌড়ি করে ঘামে ভিজে যাওয়া কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাকি পোকা ধরতে গিয়ে মিছামিছি আনন্দ করার সুখ এখনো পিছু টানে। কুপি জ্বেলে পড়ার ছলে ভাই-বোনেরা মারামারি করে পিটুনি খাওয়ার ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকা আর মায়ের পাড়াজুড়ে আমাকে খুঁজে বেড়ানোর মাঝে হঠাৎ নিজেকে সবার সামনে উপস্থিত করার মাঝে যে কৃত্রিম সুখ খুঁজে পেতাম, তা আজও আমাকে পিছু টানে।

সকালের রোদ্দুরে দৌড়াদৌড়ি করতে, লাটিম খেলতে, মার্বেল খেলতে, রোইন গাছের বিচি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে সারাটা দিন কেটে যেত। কোনো বিরতি নেই। যেন জীবনটা একটা জোনাকি পোকা। ধপদপ করে আলো ছড়াতে পারলেই বেশ। এভাবে করতে করতে কবে যে বয়স ৫/৬ বছরের দিকে চলে গেছে তাতে খেয়াল নেই আমার কিংবা আমার শ্রদ্ধাভাজন বাবা হেকিম সাহেবের। দারিদ্র্য নিয়ে যারা বড় হয়, তাদের এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। বেঁচে থাকাই যাদের দায়, তাদের কাছে এসব ভাবনা বৃথা।

স্কুল ও কলেজ জীবন

তারপরও ১৯৮৭ সালের কোনো একদিন আমি ভর্তি হই হাতিরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একটি বড় রুমের একদিকে ক্লাস ওয়ান আর অন্যদিকে ক্লাস টু পড়ানো হতো। গিয়ে বসলাম ক্লাস ওয়ানে। ময়লা আর ছেঁড়া কাপড়ে আমাকে বিধ্বস্ত লাগছিল। কেউ আমাকে পাত্তাই দেয়নি। চক আর স্লেট দিয়ে স্যারের সঙ্গে সঙ্গে 'অ' 'আ' কিংবা 'ক' 'খ' লেখার চেষ্টা করতাম। ক্লাস শেষ হলে হই-হুল্লোড় করে বাড়িতে চলে আসতাম। আমি পড়েছি কি পড়ি নাই, এগুলো নিয়ে বাড়ির কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। এভাবেই একটি বছর চলে গেল। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা, পরীক্ষা দিলাম। জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে রেজাল্ট দেবে, অনেক আনন্দ নিয়ে স্কুলে গেলাম। হেড স্যার রেজাল্ট ঘোষণা করলেন, আমি ফেল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে চলে এলাম। মা ঢেঁকি দিয়ে ধান বানেন। মা'র কাছে গেলাম। মাকে বললাম, মা আমি বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেছি। মা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। আমি কেঁদেই যাচ্ছি।

আমার বড় ভগিনীপতি কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি করেন। বোনের প্রথম সন্তান হবে। মায়ের সঙ্গে আমি কাপ্তাইয়ে গেলাম। কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেঁষে ওঠা পাহাড় আমাকে খুব টানত। পাহাড়ের গাছপালা, পশু-পাখি দেখেই শৈশব জীবনের একটি অংশ কেটে গেছে। ক্লাস ওয়ান ও টু-এর বই আমার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওগুলো পড়তাম। হঠাৎ করে আমার মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন হলো। দুই ক্লাসের বই আমি ছয় মাসেই শিখে ফেলেছিলাম। নিজের মধ্যে এক ধরনের ফোর্স কাজ করত। আমার মনে হতো আমি সব পারি। ফিরে এলাম চঙ্গভান্ডা গ্রামের বাড়িতে। ভর্তি হলাম আগের সেই হাতিরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রিতে। সেই একই স্কুল, একই ক্লাসরুম, একই শিক্ষক। কিন্তু এবার আমার কনফিডেন্স অনেক বেশি। ক্লাসে প্রথমদিকের বেঞ্চে বসা শুরু করলাম। পড়ার প্রতি যেন অন্যরকম আকুতি কাজ করত। আমি নিজ থেকেই ক্লাসের পড়াগুলো নিয়মিত পড়ে শেষ করতাম। মনে নেই, তবে

প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে উঠলাম। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। খিরাটীর কাশেম স্যার আমাকে অনেক যত্ন করে পড়িয়েছিলেন। স্যার আশা করেছিলেন, অবশ্যই আমি বৃত্তি পাব। বার্ষিক পরীক্ষার পর কনকনে শীতের মধ্যে

'মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে' গিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। মাস দুয়েক পর রেজাল্ট বের হলো। আমাদের স্কুল থেকে সৈয়দপুরের শাহনাজ পারভীন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেল। আমি কোনো বৃত্তিই পেলাম না। মানসিকভাবে মুষড়ে পড়েছিলাম। এরপর শাহনাজ পারভীন পাশের নামকরা স্কুল 'সাহাব উদ্দিন মেমোরিয়াল একাডেমি'তে চলে গিয়েছিল।

১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে আমাকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করানো হলো 'হাতিরদিয়া ছাদত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে'। এলাকার মধ্যে স্কুলটির যশ, খ্যাতি ও সুনাম অনেক। চারপাশের অসংখ্য মেধাবী ছেলেমেয়ে এই স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলের মূল দোতলা ভবনটি মাঠের উত্তর পাশে অবস্থিত। ছেলেমেয়েদের সেকশন আলাদা। মাঠের পশ্চিম পাশে টিনের ঘর। ভাঙা দরজা-জানালা আর মেঝেতে অনেক বালু। এখানেই আমাদের ক্লাস হয়। আমি কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম বিধায় দেরিতে ভর্তি হই। আমার রোল নং ছিল 'গ' সেকশনে ৬৯। সাদা শার্ট আর নেভিরু প্যান্ট ছিল ছেলেদের স্কুল ড্রেস। আমার তেমন কোনো ভালো জামাকাপড় ছিল না। প্রথমদিকে পুরোনো কাপড় গায়ে দিয়ে স্কুলে যেতাম। একদিন স্যার আমাকে দাঁড় করালেন এবং স্কুল ড্রেসের জন্য অনেক বকাঝকা করলেন। আমি কিছু টাকা জমিয়ে পরের রোববারে হাটের দিন হাতিরদিয়া বাজারের খোলা ফুটপাত থেকে একটি হাফ হাতা সাদা শার্ট ও একটি নেভিব্লু রঙের হাফ প্যান্ট কিনি। এগুলো পরেই আমি নিয়মিত স্কুলে যেতাম। বন্ধুদের তুলনায় আমার স্কুল ড্রেসটির মান ভালো ছিল না বিধায় আমি হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। মাঝেমধ্যে এত মানুষের ভিড়ে আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চটিতে আমি বসতাম। আমি নিজে নিজে বাড়িতে বসে ক্লাসের পড়াগুলো পড়ার চেষ্টা করতাম। ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বের হলো। আমাদের স্কুলের বাংলা ম্যাডামের ছেলে নারান্দী গ্রামের মাছুম ফার্স্ট হলো আর আমি সেকেন্ড হলাম। আমি এত ভালো রেজাল্ট করব ভাবিনি।

শুরুর দিকে আমার মধ্যে প্রচণ্ড ভয় কাজ করত। এত ছেলেমেয়ের মাঝে নানা কারণে নিজেকে খুব ছোট মনে হতো। তো রেজাল্টের পর

আমার মধ্যে এক ধরনের ভালোলাগা শুরু করল। ধীরে ধীরে ক্লাসের মধ্যে একটু একটু করে সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে লাগলাম। কীর্তিবাসদির 'বিপুল স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের' সপ্তম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় সমগ্র মনোহরদী উপজেলার মধ্যে আমি

দ্বিতীয় স্থান লাভ করলাম। স্কুলে আমার পরিচিতিও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। নিজের মধ্যে অন্যরকম শক্তি আর আত্মবিশ্বাস কাজ করতে শুরু করল। অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গেল। পড়ালেখায় আরও মনোযোগী হতে লাগলাম। সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার সময় আমি ফার্স্ট হলাম।

অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য সাঈদ স্যার ক্লাস নেন। মূল বিল্ডিংয়ের দোতলায় আমাদের ক্লাস হতো। জেমি, শান্তা, আশরাফুন্নাহার, প্রান্ত, মাছুম, ফখরুল, তাজুলসহ আরও অনেকে আমরা একসঙ্গে কোচিং করি। হঠাৎ একদিন লাঞ্চ টাইমে সবাই বাইরে। আমি জেমির খাতায় গানের দু-লাইন 'আমার হৃদয়টা শূন্য ছিল' লিখেছিলাম। লাঞ্চ টাইম শেষে সবাই যার যার সিটে বসল। জেমি খাতা খুলে লেখাগুলো দেখে সাঈদ স্যারের কাছে বিচার দিল। স্যার আচ্ছামতো দুটো বেত দিয়ে আমাকে মারলেন। আমি অনেক লজ্জা পেয়েছি এবং অনেক কেঁদেছিলাম। এরপরের দিনগুলো আমার এত ভালো লাগেনি। যথারীতি পড়াশোনা করে গেছি। অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে ওঠার সময় আমি আবার ফার্স্ট হলাম। ডিসেম্বরে কনকনে শীতের মধ্যে 'মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে' বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। এত ছাত্রছাত্রীর মাঝে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হতো। বৃত্তি পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কয়েক মাস পর রেজাল্ট বের হলো। আমি আর গন্ডারদিয়ার প্রান্ত সেকেন্ড গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিলাম। ওইদিকে 'সাহাব উদ্দিন মেমোরিয়াল একাডেমি' থেকে শাহনাজ পারভীন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। তার সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে আমার এক অঘোষিত স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল।

মানুষ যখন কারো কাছে হেরে যায়, তখন সে তার সম্পর্কে অনেক জানার চেষ্টা করে। আমি যখন শাহনাজ পারভীনের কাছে হেরে যেতাম, তখন আমার মনে হতো সে কি খায়, কখন ঘুমায়, রাতে ক'টা পর্যন্ত পড়ে ইত্যাদি। তাদের বাড়িটি ছিল সৈয়দপুর গ্রামে। কিন্তু কোথায় তা আমার জানা ছিল না। তো একবার আমি বাটগাঁও আমার ফুপুর বাড়ি যাব। সৈয়দপুর গ্রামের ইটের রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছি। সামনে ডোবার পাশে

একটি বাড়ি। আমার কাছে মনে হলো, এই বুঝি শাহনাজদের বাড়ি! তো এই বাড়ির চারপাশের আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি গাছ ভালো করে দেখতাম। খুব আপন মনে

হতো। ভাবতাম শাহনাজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো এই গাছগুলোর কাছে আসে। এক ধরনের রহস্য কাজ করত। পরক্ষণেই মনে হতো, না, এই বাড়ি না। সামনে আবার হাঁটতাম। ধানখেত আর বাঁশঝাড়ের মধ্যে আরেকটি বাড়ি দেখতে পেতাম। মনে হতো এটাই শাহনাজদের প্রকৃত বাড়ি। আবার সামনে আরেকটি বাড়ি পেতাম। এভাবে আমি আমার ফুপুর বাড়িতে চলে আসতাম। কিন্তু শাহনাজদের বাড়ি আমি নির্ণয় করতে পারতাম না। শুধু তাকে পেছনে ফেলার জন্য এক ধরনের আকুতি কাজ করত। যেভাবেই হোক তাকে পেছনে ফেলতে হবে। এ ধরনের অযাচিত চিন্তা শৈশবে আমার মনে দাগ কেটেছিল। ভয় ও শঙ্কার মধ্যে অনেক সময় পার করেছি। সেই স্মৃতির কথা ভেবে এখনো আমার হাসি পায়। চাঁদের আলোয় নিজেকে যখন দেখি, তখন মনে হয়, নিজের প্রকৃত সত্তাকে বুকে ধরে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাওয়াটাই শ্রেয়। তারপর ফলাফল যা হয় তাই মেনে নেওয়া উচিত। কারণ, শৈশবের সেই রেজাল্টই জীবনের সবকিছু না। করতেই হবে-এ ধরনের মানসিকতা পরিহার করা উচিত। অন্ততপক্ষে, নিজে সুস্থ থাকার জন্য সুস্থ চিন্তার কোনো বিকল্প নেই।

সামনে নবম শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে। হাতিরদিয়া বাজার থেকে পুরোনো এক সেট নবম-দশম শ্রেণির বই কিনলাম। ওই সময়টায় হাটের দিন (রবি ও বুধবার) লাইব্রেরি পট্টিতে পুরোনো বইয়ের সেট সস্তায় বিক্রি হতো। তো পুরোনো বইয়ের গন্ধ নিয়ে জানুয়ারি মাসে নবম শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করলাম। ওই সময়টায় আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারতাম না। জীর্ণ-শীর্ণ অপুষ্ট শরীর আর ময়লা কাপড় নিয়ে প্রতিদিন ক্লাস করতাম। টিফিন পিরিয়ডে একটি টাকাও থাকত না কোনো কিছু কিনে খাওয়ার জন্য। অনেকেই মজার মজার খাবার খেত। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ক্ষুধা লাগলেও কাউকে বুঝতে দিতাম না। দুঃসহ যন্ত্রণা আর মনঃকষ্ট নিয়ে ওই সময়টা পার করেছি। অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়ার সুবাদে স্কুলে কোনো বেতন দিতে হতো না। যেদিন কেরানি স্যার ডেকে নিয়ে বৃত্তির টাকাগুলো দিতেন, ওইদিন মনে হতো আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী প্রাণী। আমার ভেতর এক ধরনের দ্যুতি ছড়িয়ে

যেত। স্নায়ুগুলো সবল হয়ে যেত। এক অজানা অনুভূতি জাগ্রত হতো। সেই মুহূর্তের সেই সুখগুলো আঁকড়ে ধরে দৌড়ে দৌড়ে বাড়িতে আসতাম। রাস্তার

দুপাশের সবুজ মাঠের ওপর বয়ে যাওয়া সেদিনের বাতাসে আমার সুখগুলো আছড়ে পড়ত। মেঘহীন আকাশের নিচে বিরামহীন চলে যাওয়া আমিকে নতুন করে খুঁজে পেতাম। আঁকাবাঁকা মেঠো পথের ধুলোবালি যেন আমার আনন্দের মিছিলে শামিল হয়ে জয়গান গাইত। প্রত্যয় আর শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান মনে হতো। ভবিষ্যৎ স্বপ্নগুলো নিজের ভেতর এসে বাসা বাঁধত। স্তরে স্তরে সাজানো স্বপ্নগুলো ফানুসের মতো আকাশে উড়ে বেড়াত। বৃত্তির টাকা দিয়ে খাতা-কলম কিনতাম। ওই টাকাগুলো আমার জীবনে অনেক উপকার করেছিল। আমার এই দুরবস্থা দেখে সৈয়দপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ফজলু স্যার আমারই এক ক্লাসমেটের চানমেহেরের নোয়াদিয়া বাড়িতে লজিং থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাড়িটি একবার গিয়ে আমি দেখেও এসেছি। পরবর্তী সময়ে নানা কারণে ওই বাড়িতে আর যাওয়া হয়নি। নবম শ্রেণিতে কষ্ট করে হলেও পড়ালেখা চালিয়ে গিয়েছি। নবম থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার সময় আমি আবার ফার্স্ট হলাম।

দশম শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করলাম। ভালো লাগছিল। নিজের মধ্যে একটা প্রত্যয় এবং স্বপ্ন কাজ করছিল। বাড়ির দক্ষিণ পাশের খেত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পানিতে টইটম্বুর থাকত। ধানের শিষের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বাতাস ভালো লাগত। আইলের পাশে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতাম। আমার যেহেতু দাঁড়িয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল, সেহেতু মাঝে মাঝে আইলে হাঁটতাম আর দাঁড়িয়ে পড়তাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়ের পর আম কুড়াতাম কিংবা কাঁঠাল গাছে উঠে কাঁঠাল পাড়তাম। বিল-ঝিলে শালুক কুড়াতাম। সিঅ্যান্ডবির খালে প্রচুর সাঁতার কাটতাম। শৈশবের এতসব দুরন্তপনার মাঝেও লেখাপড়ার প্রতি অন্যরকম আকর্ষণ কাজ করত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম। তখন বাড়িতে কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কুপি কিংবা হারিকেন জ্বালিয়ে শেষ রাতে উঠে পড়তাম। কুপির লাল আলোয় বইয়ের অক্ষরগুলো সোনালি মনে হতো। কোনো-না-কোনোভাবে কেরোসিন বইয়ে লেগেই যেত। চারদিকে সুনসান নীরবতা। কোথাও কেউ নেই। পাশের তাল গাছের শোঁ শোঁ বাতাসে এক অজানা ভয় কাজ করত। পাশের বাঁশঝাড়ের কালো অন্ধকারের ভয়ে গা ছমছম করত। গাছের একটি পাতা পড়লেই ভয়ে আঁতকে উঠতাম। তবুও শেষ রাতে উঠতাম। কারণ,

শেষ রাতে পড়া খুব মুখস্থ হতো। ফজরের আজান দিলে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তাম। কেরোসিনের সেই গন্ধমাখা বই আজও আমায় গ্রামে নিয়ে যায়।

মসজিদ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সরু আইলের দূর্বা ঘাসের শিশির আজও আমায় অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমার সেই সোনালি দিনগুলো। দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা হলো। আবার ফার্স্ট হলাম। তখন স্কুলের মেইন বিল্ডিংয়ে ক্লাস হতো। একদিন দেখি স্কুলের মাঠে সবাই এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করছে। আমিও একটি ফরম নিলাম। মাঠে বসে আছি। হঠাৎ আব্দুল হাই মৌলবি স্যার ডাকলেন। মৌলবি স্যারকে আমি খুব ভয় পেতাম। স্যার যাকে ধরতেন তাকে নাজেহাল করে ছাড়তেন। একবার এক ছাত্র স্যারের মার খেয়ে ক্লাসে সবার সামনে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। তো ভয়ে ভয়ে আমি স্যারের কাছে গেলাম। স্যার বলল, ফিরোজ তোর নামটা আমার পছন্দ না। আমি তোর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখতে চাই। আমি তো অবাক। বলে কী স্যার! ফিরোজ নাম দিয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে এই পর্যন্ত এলাম। কখনো আমি মো. ফিরোজ মিয়া আবার কখনো ফিরোজ আহমেদ হিসেবে নাম ব্যবহার করতাম। আমিও মাঝে মাঝে এই দুই রকম নাম নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তাম। আমি চুপ মেরে গেলাম। স্যার আমাকে বললেন, তুই আজ বাড়িতে গিয়ে তোর বাবা-মা'র সঙ্গে আলোচনা করে আগামীকাল আমাকে জানাবি। তারা রাজি থাকলে আমি তোকে একটি সুন্দর নাম দিয়ে দেব। আমি সোজা বাড়িতে এলাম। ঘটনা তাদের খুলে বললাম। আমার বাবা-মা'র আমার লেখাপড়া কিংবা নাম নিয়ে তেমন কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। তাঁরা রাজি হয়ে গেল। আমি পরের দিন স্যারের কাছে গেলাম। স্যারকে বললাম: স্যার, আপনি আমার নাম পরিবর্তন করতে পারবেন। কোনো সমস্যা নেই। আমার বাবা-মা দুজনেই রাজি আছে। স্যার মহা খুশি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্যার বললেন, তোর নাম 'মাহমুদুল হাছান'। স্যারকে আমি বললাম: স্যার, নামের আগে মো. দেবেন না? স্যার বলল, মাহমুদুল হাছান নামের অর্থ দিয়েই মো.-এর মিনিং কভার করে। তখন আবার নিজের নামের প্রতিটি অক্ষরের বিপরীতে রেজিস্ট্রেশন ফরমের গোল গোল ঘর পূরণ করতে হতো। আমিও তাই ছোট নাম নিয়ে স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম। সেই থেকে আমি মাহমুদুল হাছান। মরহুম স্যারের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আমি দোয়া করি মহান

রাব্বুল আলামিন যেন স্যারকে বেহেশতের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

আমার জন্মতারিখ নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। সত্যিকার অর্থে কবে আমার জন্ম তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। আমি আমার মা ও বাবাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। আমার মা অনুমান করে বলেছিলেন, সম্ভবত ভাদ্র মাসের তালের সিজনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। বাস্তবতা যাই-ই হোক, পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাস করে যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন 'হাতিরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মানিক স্যার আমার জন্মতারিখ অনুমান করে সার্টিফিকেটে লিখে দিয়েছিলেন 'ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮১'। সেই থেকে আমার জন্মতারিখ ওটিই চলে আসছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সার্টিফিকেটের তুলনায় আমার বয়স কম!

১৯৯৭ সালের এএসসি পরীক্ষায় আমি মনোহরদী উপজেলায় সর্বোচ্চ ৮৫৫ (১০০০-এর মধ্যে) নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি। 'সাহাব উদ্দিন মেমোরিয়াল একাডেমির' শাহনাজ পারভীন দ্বিতীয় হয়। এবার আমি জিতে গেলেও তার প্রতি আমার যথেষ্ট মায়া জন্মেছিল। সেই-ই প্রথম হবে এ ধরনের স্বাভাবিক সত্য আমি মেনে নিয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল, সে প্রথম হলে সেদিনের আকাশ আরও অনেক সুন্দর হতো। সেদিনের বিকেলের নীরবতাটা আরও আগেই ভেঙে যেত। জোছনার ঝলমলে আলোয় পৃথিবী আরও অনেক শুভ্র হতো। জিতে গেলে পরাজিতদের প্রতি কেন যে আমার এমন মায়া হয়! জানি না। হয়তো নিজের সুখের চেয়ে অন্যের সুখে আনন্দ পাওয়ার মজাই আলাদা!

কিন্তু দুঃখ হলেও সত্য যে, আমারই আপন বড় বোন মার্জিয়া 'নোয়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে ওই বছরই এএসসি পরীক্ষায় ফেল করে। সে কিন্তু মোটামুটি পড়ালেখা করত। পরিশ্রম করত। কয়েক মাইল হেঁটে নিয়মিত স্কুলে আসা-যাওয়া করত। অন্তত পক্ষে, পাস করার মতো অবশ্যই পড়ত। একই বই আমরা দুজন ভাগাভাগি করে একই টেবিলে পড়েছি। অনেক মারামারিও করেছি। কখনো কখনো আমি তাকে অঙ্ক বা অন্যকিছু বুঝিয়েছি। মেধা আল্লাহ প্রদত্ত। সব সময় পরিশ্রম করলে সফল হওয়া যায়-এ কথাটি সঠিক নয়। আমি ভাগ্যকে ভীষণ বিশ্বাস করি। জীবনের অনেক প্রশ্ন থাকে, যেগুলোর কোনো উত্তর নেই। উত্তর চাইতে গেলে

দুঃখকে বাড়িয়ে তোলে। তো রেজাল্টের পর আমাদের পরিবারে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। ফেল করে আমার বোনটি বারবার মূর্ছা যাচ্ছিল। এই ধরনের দুঃখ ব্যাখ্যা করা যায় না। পাড়ার মধ্যে আমাদের বাড়িটি সেদিন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। সুখ ও দুঃখের ক্যামেস্ট্রিতে আমরা সবাই সেদিন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনের সূর্যাস্ত আজও আমাকে কাঁদায়। আমি আনন্দ করতে পারলাম না।

এসএসসি পাসের পর আমার মনের ভেতর অনেক স্বপ্ন কাজ করতে শুরু করল। আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইয়ের (তারা মিয়া) বন্ধু মোস্তফা ভাই (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী) তখন ঢাকা কলেজে মানবিক বিভাগে পড়তেন। ওনাকে দেখে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে গেলাম। আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করলে তখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ার উপযোগী নই। পরিবার থেকেও তেমন কোনো সায় ছিল না। কিন্তু আমার মধ্যে এক ধরনের জিদ কাজ করত। আমি একা একা ঢাকায় গেলাম। নীলক্ষেত আর নিউমার্কেটের অলিগলি পার হয়ে ঢাকা কলেজ খুঁজে পেলাম। বিশাল লাইন। ফরম নিলাম। ফরম পূরণ করে জমা দিলাম। আবার গুলিস্তান হয়ে বাড়িতে। আমার ভালো লাগছিল না। এত এত মেধাবী আর বোর্ড স্ট্যান্ডধারী ছাত্রকে দেখলাম যে, আমার চান্স পাওয়ার আশা ক্ষীণ। আমি চলে গেলাম সুফিয়া আপার পলাশ ওয়াপদার বাসায়। মনে মনে স্থির করলাম, এখানেই ইন্টারমিডিয়েট পড়ব। পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজ ঘুরে দেখে এলাম। তারা মিয়া ভাই পাশেই এক গ্রামে লজিং থেকে এই কলেজে পড়তেন। শিল্পাঞ্চল কলেজকে আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি।

পরের দিন (৩০/৮/১৯৯৭ ইং) খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। এদিকে ঢাকা কলেজের ভর্তির কোনো খবর নেই। আমার ক্রমিক নং ছিল ৯৪৪৩। বন্ধুদের কাছ থেকে শুনলাম, মেধাতালিকায় ওয়েটিং লিস্টে নাকি আছি! আপাকে বলে ওয়াপদা গেট থেকে ঢাকাগামী বাসে উঠলাম। এত সকালে একা একা ঢাকা যাচ্ছি, ভয় লাগছিল। সকাল ৮টার মধ্যে গুলিস্তান পৌঁছলাম। গোলাপ শাহ মাজার থেকে বিকল্প পরিবহণ ধরে তাড়াতাড়ি ঢাকা কলেজে গেলাম। পরিচিত কেউ নেই। এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে নোটিশ বোর্ড দেখলাম। আমার ওয়েটিং তালিকা থেকে ভর্তি দুদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। যাদের মার্ক ৮৪০-৮৪৫ শুধু তারা ভর্তি হবেন

৩১/৮/১৯৯৭ ও ০১/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখে। আমি বিচলিত হয়ে গেলাম।

রসুলপুর গ্রামের বেপারি বাড়ির মানিক স্যারের ছেলে ফারুক ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিউমার্কেটের উলটো পাশে আজিমপুর সরকারি কলোনিতে মো. ছিদ্দিকুর রহমান নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি জগন্নাথ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। উনি অনেক আগে হাতিরদিয়া স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছিলেন। বাড়ি সনমানিয়া। তো আমি দৌড়ে স্যারের বাসায় গেলাম। একই স্কুলের হওয়ায় উনি আমাকে একটু খাতির করলেন। উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ড. ইমাম হোসেন স্যারের কাছে। আমি দ্রুত কলেজে চলে এলাম। অপেক্ষা করছি স্যারের জন্য। স্যার এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন ভর্তি কক্ষে। প্রথমবার তারা আমাকে ফিরিয়ে দিলেও এবার স্যারের অনুরোধ রাখলেন। ভর্তি হলাম ঢাকা কলেজে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের ৫১৪ নম্বর রুমের মোস্তফা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে গ্রামের বাড়ি চলে এলাম।

তো বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়িতে আছি। স্কুলবন্ধু তাজুলের সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার প্ল্যান করলাম। আমি বাড়ি থেকে ০৭/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখে সকালে হাতিরদিয়া বাসস্ট্যান্ডে বসে রইলাম। তাজুল আসবে তারপর একসঙ্গে দুজন ঢাকায় যাব। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাজুল আর আসেনি। তারপর আমি তার বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি সে আমাকে রেখেই ঢাকায় চলে গেছে। তারপর আর গত্যন্তর না পেয়ে একাকী আমি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হই। গিয়ে উঠি নরসিংদীর অনার্সপড়ুয়া যোবায়ের নামের এক বড় ভাইয়ের দক্ষিণ ছাত্রাবাসের ১১১ নং রুমে। ওই বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভর্তির দিন হালকা একটু পরিচয় হয়েছিল। উনি আমাকে মাস্টার্স ছাত্রাবাসে দুপুরে খাওয়ালেন। ওই রাতে আমি ওই রুমেই ছিলাম। পরের দিন আমি ঢাকা কলেজে প্রথম ক্লাস করি। ক্লাস শেষে দেখি আমাদের স্কুলের সিনিয়র আলামিন ও মোর্শেদ। তারা বলল, চল আমাদের মিরপুরের মেসে। তাদের সঙ্গে ২৫/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত মিরপুর-২-এর ব্লক জি/১, ৪ নম্বর রোডের ৫ নম্বর বাসায় ছিলাম। ঢাকা কলেজে আমার জীবনটা খুব সুখের ছিল না। থাকা-খাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। আর্থিক অনটনের জন্য কোথাও বাসা ভাড়া করে থাকব, সে সুযোগটুকু ছিল

না। হঠাৎ একদিন ঢাকা কলেজের নোটিশ বোর্ডে দেখি গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য মিরপুর-১২-তে 'ইমাম জাফর সাদেক হোস্টেল'-এ ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

আছে। নিচে যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া আছে: আবুল হোসেন, ৪১/৪ এফ ব্লক জহুরী মহল, বাবর রোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, ফোন: ৩২৪৪১৫। ভাইভার জন্য সোজা চলে গেলাম ওনার বাসায়। দোতলার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন। চেয়ারে বসলাম। নুডলস দিল, খেলাম। ভদ্রলোক এলেন। নানারকম প্রশ্ন করলেন। আমি যতটুকু পারি উত্তর দিচ্ছি। তবে বুঝলাম ওনার প্রশ্নের মূল ভিত্তি ছিল, ইসলাম ও সমসাময়িক বিষয়ে। বিশেষ করে ইরানের ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লবের কথা। ভাইভা পাস করেছিলাম। শেষে আমি বাড়ি চলে আসি। পরবর্তী সময়ে ২৮/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখে আমি মিরপুর-১২-তে ইমাম জাফর সাদেক হোস্টেলে উঠি।

কয়েক মাস ওখানে থাকলাম। ওই হোস্টেলের দুপাশেই বস্তি ছিল। বর্ষার দিনে হোস্টেলে আসা ও যাওয়ার পথ কর্দমাক্ত থাকত। ময়লা ও দুর্গন্ধ ছিল। সুপেয় পানির খুব সংকট ছিল। আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে মাসিক টাকা নেওয়া হতো। অনেকে ফ্রিও থাকতেন। আবুল হোসেন সাহেব সপ্তাহে একদিন এসে আমাদেরকে ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধে বড় হওয়ার উপদেশ দিতেন। উনি বড় ভালো লোক ছিলেন। শুনেছি উনি মারা গেছেন। আল্লাহপাক ওনাকে বেহেশত নসিব করুন-এই দোয়া করি। এক সময় আমি এই হোস্টেল ছেড়ে দিই। অবশেষে ১৮/১২/১৯৯৭ ইং তারিখে ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসের দোতলার ২১৩ নং রুমে উঠলাম। ২০ মে ১৯৯৮ সালে আমার প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়। মোটামুটি পড়াশোনা করলাম। মাথার চুলও ফেলে দিয়েছিলাম। সামনে মে, ১৯৯৯ ইং ফাইনাল পরীক্ষা। সিট পড়ল সরকারি তিতুমীর কলেজে। ঢাকা কলেজ থেকে সিএনজি করে একা একা তিতুমীর কলেজে যেতাম। রাস্তায় এত যানজট থাকত যে, মাঝেমধ্যে খুব দুর্বল হয়ে পড়তাম। বিশেষ করে রসায়ন দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার সময় হলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল পরীক্ষা বাদ দিই। শেষমেশ পরীক্ষা দিয়েছি। মনের মতো করে পরীক্ষাগুলো দিতে পারিনি। এভাবেই সবকটি পরীক্ষা শেষ করলাম। রেজাল্ট বের হলো ২৬/০৮/১৯৯৯ ইং তারিখে। আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। তারপর আমি প্রথমে

শেওড়াপাড়া, মিরপুর এবং পরে কলাবাগান, বশিরউদ্দিন রোডের নাজমা মঞ্জিল বাসার মেসে উঠলাম। মেডিকেলে ভর্তির জন্য রেটিনা, ফার্মগেট শাখায় ভর্তি হলাম। নানা টেনশন আর সমস্যা নিয়ে কোচিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন

প্রথমবার আমি ভর্তি হই গণিত বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট পাইনি। থাকি পাশেই 'প্রত্যাশা' নামের একটি মেসে। মেস ভাড়া ও খরচ মিলিয়ে আমি পারছিলাম না। সিলেটে জিনিসপত্র খুব ব্যয়বহুল। ২৩ আগস্ট ২০০০ ইং তারিখে উঠি মেসটিতে। ২৭ আগস্ট ২০০০ ইং তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হলো। গণিত বিষয়ে খুব একটা মজা পেতাম না। মেস থেকে এসে পাশের 'শাহজালাল' হলে দুপুর ও রাতে খেতাম। চারপাশের পাহাড় আর সুনসান নীরবতা আমার খুব ভালো লাগত। হঠাৎ ধুমধাম অনেক বৃষ্টি হতো। পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে ভারতের সারি সারি পাহাড় যেন দেখা যেত! একদম খারাপ লাগেনি সিলেটের এই পরিবেশ। কিন্তু বিপত্তি বাধল আমার মাসিক খরচ। পরিবার থেকে যে টাকা দেওয়া হয়, তা দিয়ে মাস চলে না। উপায় না দেখে আমি সিলেট শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিতরণ করে অনেক কষ্টে একটা টিউশন ম্যানেজ করেছিলাম।

তো ভাবলাম সিলেট থেকে চলে যাব। ওভারনাইট বাসে সিলেট থেকে ময়মনসিংহে আসি। উঠি আমারই মেসের জহির ভাইয়ের বন্ধুর রুমে, আশরাফুল হক হলে। নিরিবিলি টেনশনবিহীন পরীক্ষা দিয়েছি। মেধাতালিকায় ৮৭তম স্থান অর্জন করলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহ ভর্তি পরীক্ষায়। ভর্তি হলাম মাৎস্য বিজ্ঞান বিভাগে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমি দুবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়েও মেডিকেলে সুযোগ পাইনি। বাকৃবিতে আমার হল অ্যাটাচমেন্ট হলো ঈশা খাঁ হলে। মে ৫, ২০০১ সালে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ছিল। আমি বাড়িতে খেলাধুলায় এত বেশি মগ্ন ছিলাম যে, এদিকে খেয়াল রাখতে পারিনি। ওরিয়েন্টেশন মিস করলাম। তখনকার দিনে এরকম ফেসবুক কিংবা অনলাইন সুবিধা এত ছিল না। যাইহোক, আমি মে ৭, ২০০১ সালে প্রথম ক্লাসে যোগ দিলাম। প্রথম কয়েকদিন আমি নারান্দির শফিকুল ভাইয়ের সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ৪২৬ নং রুমে থাকি। পরে ঈশা খাঁ হলের পূর্ব ভবনের

গণরুমে উঠলাম। বিশাল রুম। এক কোণে ভাঙা চৌকিতে আমার বিছানা বিছালাম। নানা জেলার নানা প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশতে হতো। প্রতিটি জেলার মানুষের কথাবার্তায় ও চিন্তাচেতনায় কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকত। প্রতিটি ছেলেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ওরা অনেক মেধাবী। কেউ খালি গলায় এমন গান

গাইত যে, প্রফেশনাল গায়কদেরও হার মানাত। কেউবা সুন্দর ঢোল বাজাত, কেউবা সুন্দর সুন্দর ড্রয়িং আঁকত, কেউবা ভালো বল কিংবা ক্রিকেট খেলত। গান, বাজনা, হই-হুল্লোড় ছিল নিত্যসঙ্গী। পিন্টু নামের ছেলেটির হাতের লেখা আজও আমার চোখে ঝকঝক করে ভাসে। এগুলো আমার ভালোই লাগত। রাতে এত বেশি তাস খেলা হতো যে, আমি ভালোভাবে ঘুমাতে পারতাম না। মাঝে মাঝে আমি খুব অসহায় ফিল করতাম। অবশেষে আমি চলে গেলাম বি-৪ টিনশেড বিল্ডিংয়ে। ওখানে কিছুদিন ছিলাম। তারপর চলে এলাম পশ্চিম ভবনের তিন তলায় এবং পরে দোতলার ২০৪ নং রুমে। 'ইংলিশ সোসাইটির' মেম্বার ছিলাম। সপ্তাহে একদিন আমি, সুমন ভাই, কমলদা ও আরও অনেকে গেস্ট রুমে বসে ইংরেজিতে কথা বলার প্র্যাকটিস করতাম। হল-জীবনের শুরুর দিকে নানা ঘটনার পরিক্রমায় সিনিয়ররা কেউ কেউ আমাকে নানারকম হয়রানি করেছে।

প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকায় আমি ৮ম হয়েছিলাম।

প্রথম বছরটা আমাকে নানা প্রতিকূলতার মাঝে পার হতে হয়েছে। আর্থিক অনটনের জন্য আমি শেষ মোড়, ফসিলের মোড়, কেওয়াটখালীর রেলওয়ে কলোনি ও শহরের তাজমহল এলাকায় টিউশন করেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষটা আমার চলে গেছে। ফাইনাল ইয়ারে আমি দ্বিতীয় হলাম। কিন্তু সম্মিলিত মেধাতালিকায় আমি ৬ষ্ঠ হলাম। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে

আমার সহোদর তারা মিয়া ভাই ও বাবা ২০০৬ সালের আগস্ট মাসেই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। জীবনের ওপর অন্ধকার নেমে এসেছিল। আমি খুব দুঃসময় পার করছিলাম।

২০০৬ সালের জানুয়ারিতে আমি ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগে প্রফেসর ড. মো. মোখলেসুর রহমান খান স্যারের অধীন মাস্টার্সে ভর্তি হই। স্যার অনেক পরিশ্রম করাতেন। সারা দিন ফিশারিজ ফিল্ড কমপ্লেক্সের পুকুরে থিসিসের এক্সপেরিমেন্টের জন্য কাজ করতাম। কখনো কখনো মাছের খাবার কেনার জন্য ময়মনসিংহের ছোট বাজার কিংবা

শম্ভুগঞ্জ যেতাম। ভ্যান গাড়ির ওপর খাবারের বস্তা রেখে তার ওপর বসতাম। মিক্সড ফিডটা আমি নিজেই তৈরি করতাম। পুকুরে আমি নিজেই খাবার দিতাম। ডেটা নেওয়ার দিন বন্ধুরা হেল্প করত। কই মাছের স্পার্মের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আমিনুর ভাইয়ের (বর্তমানে উনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত) কাছে যেতাম। উনি আমাকে অনেক হেল্প করেছিলেন। থিওরি ক্লাসেরও অনেক চাপ থাকত। এভাবেই আমার এমএস-জীবন চলছিল। ২০০৭ সালের জুনে থিসিস জমা দিই এবং এমএস ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করি। আমি জিপিএ-৩.৯০৬ পেয়ে এমএস রেজাল্টে ৩য় স্থান অর্জন করি।

এদিকে চাকরির জন্য বিএফআরই পরীক্ষা দিই। লিখিত পরীক্ষায় টিকেও যাই। বিসিএসের জন্য দরখাস্ত করি। এরইমধ্যে মোখলেছ স্যারের সঙ্গে আলোচনা করে মনোবুশো স্কলারশিপের জন্য জাপানে আবেদন করি। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে ফাইনালি সিলেক্ট হই। জাপানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। বলতে দ্বিধা নেই, আমার ফ্যাকাল্টির জুনিয়র এক মেয়েকে খুব ভালো লাগত। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়েটি রাজি হয়নি। মেয়েরা রাজি না হলে ছেলেদের মেজাজ খুব চড়া হয়ে যায়। চড়া মেজাজ আর মায়ার সমন্বয়ে ছেলেরা এক সময় দুর্বার হয়ে ওঠে। তখন মানুষ ঠিক-বেঠিক পরিমাপ করতে পারে না। এটাকেই হয়তো মুরুব্বিরা বলে থাকে 'বয়সের দোষ'। তখন আমার মাঝে এক ধরনের আবেগ কাজ করত। শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে আমি জীবনকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। তাকে নিয়ে আমি একটি কবিতাও লিখি। লেখাটি জাপানে যাওয়ার পর লেখা হয়েছিল:

অপেক্ষার সমাপ্তি কবে?

কোনো এক শরতের সকালে, মৃদু মাখা রোদে

তোমাকে দেখেছিলাম জানালার ফাঁকে।

ঝিরিঝিরি বাতাসে তোমার গ্রীবার ওপর

পূর্বের লাল আভা এসে পড়েছিল।

আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছিল।

বাকৃবির সবুজ চত্বরে তোমার হাঁটা-চলা

কিংবা নোট পড়তে পড়তে ফ্যাকাল্টিতে আসা

কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে

অট্টহাসিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া

হয়তো বা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফুল তুলে

খোঁপায় ঝুলিয়ে হলে ফেরা।

কে আর মার্কেটে চায়ের কাপে চুমুকের ফাঁকে

তোমাকে দেখেছিলাম-

কি জানি কি বাজার করে বা কাঁধে ব্যাগটি ফেলে

দ্রুত পায়ে হলে গিয়েছ।

একবারও হয়তো পেছনে ফিরে তাকাওনি।

আমি পেছন থেকে দেখেছি

তোমার থরথর নিতম্ব, নূপুর ঝাড়ানো স্নিগ্ধ পা।

হেমন্তের কোনো একদিনে

কোনো এক তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকালে

শহর থেকে হলে ফিরছিলে

তোমার চুল, ব্রু, চোখ ও ঠোঁটে

দেখেছিলাম আনন্দের ঝিলিক।

আমার ভালোবাসার বীজ বপন সেদিন।

আজ আমি জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির ছাত্র

কত বাঙালি, কত অ্যারাবিয়ান, কত ইজিপশিয়ান, চাইনিজ কিংবা কত ইন্দোনেশিয়ান দেখি

গার্ডেনে, মাঠে, বৃক্ষে-বাগানে কত আড্ডায় মজা করে যায় আমি পারি না।

জীবনে অনেক কিছু পেয়েও মনে হয় কিছু পেলাম না।

মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়

বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন দূরের আকাশ দেখি

তখন একখণ্ড অখণ্ড আকাশে জ্যোৎস্নারাতে

সেই পাহাড়ের ওপারের নীরব অরণ্য দেখে মনে হয় তুমি আসছ।

এই কল্পনায় হারিয়ে যাই আমি।

অতীতের সঙ্গে হয় কথোপকথন।

আমার সারা দিনের চিন্তা, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে তুমি

তোমাকে কেন আমি এত ভালোবাসি জানি না।

দিন-মাস-বছর পেরিয়ে আর কতকাল যাবে

কবে পাব তোমায়!

কবে হবে আমার অপেক্ষার সমাপ্তি!

জাপানে গমন

দোসরা অক্টোবর ২০০৮। বাংলায় আশ্বিনের প্রথম দিন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই মনে হলো রোজা শেষ, আজ পবিত্র ইদুল ফিতর। সামনে শীত বলেই কি না, ওইদিন প্রকৃতিটা কিছুটা শুষ্ক ও রুক্ষ রুক্ষ ভাব ছিল। অজু করে গেলাম ফজরের নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে বাড়িতে এসে ঈদের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আর ভাবছি ঈদের নামাজে গিয়ে সবাইকে বলব: আমি মনোবুশো স্কলারশিপ পেয়েছি, আমার জন্য দোয়া করবেন। পারিবারিক কিছু অসুবিধার কারণে খবরটা তখন না বলে কয়েকদিন পরে বলার জন্য মনস্থির করেছিলাম। অনেক চেষ্টা করে এই বিশাল আনন্দের খবরটা কোনোরকমে বুকের মধ্যে চেপে ইদের নামাজে গেলাম। হুজুর একদিকে বয়ান করছেন আর আমি মনে মনে ভাবছি কী সুন্দর আমাদের গ্রাম, কত সহজ-সরল আমাদের গ্রামের মানুষ। তাদেরকে অনেকদিন দেখব না-ভাবতেই চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। খুশির দিনে আমি অনেক চাপা ব্যথা নিয়ে নামাজ শেষ করে বাড়ি এলাম। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বাবার কবর জিয়ারত করলাম। বাবার কবরের কাছে যেতেই মনে হলো, কত সহজ-সরল ছিলেন আমার বাবা। বাবা কোনোদিন আমাকে মেরেছেন বলে মনে পড়ে না। যতদূর মনে পড়ে, আমি যখন ৮ম শ্রেণিতে স্কলারশিপ পেলাম, তখন বাবা হয়তো বুঝতে পারেননি তার ছেলে অন্যদের চেয়ে ভালো। যখন ১৯৯৭ সালে আমি মনোহরদী উপজেলা থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে

এসএসসি পাস করি, সেদিন দেখেছিলাম বাবার চোখে-মুখে খুশি ও আনন্দের ঝিলিক। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন বাবার মনটা কিছুটা মনমরা দেখতাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন বাড়িতে আসতাম তখন বাবা বলতেন: 'আচ্ছা বাবা, তুমি কি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারবে?

বাবার কথা শুনে আমার কিছুটা রাগ হলেও ভাবতাম, না আরও অনেক বড় কিছু হব। আজ যদি বাবা থাকতেন হয়তো মানুষের কাছে বলতেন: 'আমার ছেলে স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে গেছে। দোয়া করবেন।

বাবা, তুমি আজ চঙ্গভান্ডার একটি জঙ্গলের পাশে ঘুমিয়ে আছ। জানি না কেমন আছ? কত সাপ-বিচ্ছু আর চারপাশের হাজার মন মাটির ভার নিয়ে ঘুমিয়ে আছ। মনে হয় তুমি ভালো আছ। যাইহোক, তুমি কবর থেকে কি আমাকে দেখতে পাও না? তোমার না খেয়ে জমানো টাকা দিয়ে যে কেরোসিন তেল কিনে দিয়েছিলে আর আমরা কুপি জ্বালিয়ে পড়েছিলাম। সেই কষ্ট বৃথা যায়নি বাবা। তুমি দ্যাখ 'তোমার ছেলে পৃথিবীর একটি উন্নত দেশের একটি নামকরা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে যাচ্ছে'। আমার মনে হয় তুমি একজন সার্থক পিতা আর আমার মা একজন সার্থক গর্ভধারিণী।

যাকগে এসব কথা। এরপর গেলাম তারা মিয়া ভাইয়ের কবর জিয়ারত করতে। কবরটা চারপাশের মাটি ভেঙে ভাইয়ের বুক বরাবর ঝুলে আছে। পৃথিবীটা কত আশ্চর্য! এই ভাইকে দেখেছি কোনোদিন তার গায়ে একটি মাছিও বসতে পারত না। সেই ভাই আজ কোথায়? তার ছেলে মাহিদ, মেয়ে ইকরা ও অসহায় ভাবির দিকে তাকালে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ উহ্ না বলে পারে না। কবর জিয়ারত করে বাড়িতে এসে মনে পড়ল আজই শেষ দিন বাড়িতে থাকার। আগামীকাল খুব ভোরে রওয়ানা দিতে হবে। যত পারছি নিজের দুঃখগুলো গোপন করে সবার সঙ্গে হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করেছি। নাশতা শেষ করে আলিমউদ্দীন ভাইয়ের ছেলে মোস্তফার রিকশায় চড়ে কিছু আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলাম আর ফিরে আসতে রাত ৯টা বেজেছিল। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া, নামাজ শেষে ঘুম।

পরের দিন ৩ অক্টোবর ২০০৮ সাল। ঘুম থেকে উঠেই দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি। গেলাম ফজরের নামাজ পড়তে। আমি, হাই ভাই (বাছেদের আব্বা) ও ছানা মিলে কোনোরকম নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরলাম। তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখন মাহিদ আর ইকরা আমার পাশে

এসে দাঁড়াল। মাহিদের গায়ে আমার হাত লাগতেই সারা শরীরটা কাঁপুনি দিয়ে এলো। মনে হলো, এই অসহায় মাহিদ ও ইকরাকে অনেকদিন কাছে পাওয়া যাবে না। মাহিদ কিছুটা রাগী, তেজি, ভয়ংকর-যা দেখলেই তার বাবার কথা মনে পড়ে। ইকরা কিছুটা ভিন্ন রকম, মেয়েরা সাধারণত যা হয়- খুবই নম্র-ভদ্র। ওদের আশীর্বাদ করে মা, ভাবি, ভাইসহ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম।

সরাসরি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে। সেখানে কাজ শেষ করে রাতে মহাখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে। রাতে সেখান ছিলাম। পরের দিন ৪ অক্টোবর ২০০৮ সাল। সকালে গোসল-নামাজ সেরে পুনরায় লাগেজটা গোছালাম। নিয়ে যাওয়া যাবে মাত্র ৩০ কেজি। বারবার ওজন করে শেষবারের মতো অনুমান করলাম। মনে হয় ঠিক আছে। কাজল ভাই একটি সিএনজি নিয়ে এলেন। আমরা সবাই মালপত্রসহ সিএনজিতে বসে পড়লাম। সিএনজিটি মহাখালী রোড দিয়ে দ্রুতগতিতে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে। ব্যস্তময় ঢাকা শহরের সব মানুষকে মনে মনে বিদায় জানালাম। গুড বাই, ঢাকা শহর। এরইমধ্যে ফোন করলাম দু-একজন অতি কাছের মানুষকে। আরও কয়েকজনকে ফোন করব ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এসে থামল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনালে। তখন সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটা। বিমানবন্দরের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে, যেন থাই এয়ারলাইনসের সব যাত্রী ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পাশে তাকাতেই দেখি মামা, নজরুল ভাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ মোড়ে যে বাসায় প্রাইভেট পড়াতাম সেই বাসার আন্টি, আঙ্কেলসহ অনেকে। দীর্ঘদিনের জন্য বিদায়। কাছে যেতেই মনের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। কেঁদে ফেললাম সবার অজান্তে। এই সুন্দর চকচকে গ্লাসের দরজা দিয়ে ঢুকলেই শেষ। দেখা হবে না আর! মনকে অনেক শক্ত করে নিষ্ঠুরের মতো সবাইকে বিদায় জানিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। প্রথমে সব লাগেজ চেক। বড় লাগেজটা চেক করতে লাইনে দাঁড়ালাম। জয়নাল ভাই একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কথা বলা যাচ্ছে না। ভেতরে এত বড় ফাঁকা জায়গা, মনে হয় কেউ কারো নয়। এ অবস্থায় একজন মাঝ বয়সি লোক কালো মোচ, দাড়ি নেই, বয়স আনুমানিক ৪০ কিংবা ৪৫। বললেনঃ 'ভাই আমি আপনাকে সব কাজ করে দেব, চিন্তিত হবেন না।' উনি অবশ্য লাগেজ বেল্টে ওঠা-নামার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন। সবশেষে ওনাকে দিলাম ৫০০ টাকা। ব্যাগ চলে গেল বেল্টে। আমি আমার মোবাইল ফোনটা জয়নাল ভাইকে দিয়ে শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে

ঢুকে পড়লাম সরু রাস্তা দিয়ে ইমিগ্রেশন রুমে। সামনে লাইন। দাঁড়ালাম সবচেয়ে ছোট লাইনে। পরপর চেক করার পর আমার পালা। ইমিগ্রেশন পুলিশ অফিসার আমার পাসপোর্ট, ভিসাসহ অন্যান্য কাগজপত্র চেক করার পর চাইলেন হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার। মাথা ঘুরে গেল, বলে কী? এসব কাগজপত্র আনার কথা কেউ কোনোদিন বলেনি বা আমিও এসবের প্রয়োজন মনে করিনি। সেই পুলিশ অফিসার নিয়ে গেলেন তার বসের কাছে। তিনিও 'হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির' সব কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। এখন কী করি! আশপাশে পরিচিত কেউ নেই। কান্না এসে গেল। জয়নাল ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা বা কথা বলার সুযোগ নেই। ভাবলাম, এখানে কি আমাকে আটকে দেবে। সহায়তা নিতে চাইলাম বাংলাদেশ বিমানে চাকরি করে আমারই হলের শফিক নামের এক ছোট ভাইয়ের। সে এগিয়ে এলেও সর্বশেষ বলল তার কিছুই করার নেই। আশপাশের দেশি-বিদেশি সবাই তাকিয়ে দেখলেন আমার ছোটাছুটি, ভয়, হাহাকার। শরীর থেকে অটোমেটিক ঘাম ঝরতে লাগল। একজন বাঙালি অবশ্য ওনার ল্যাপটপ থেকে আমাকে মেইল চেক করে, অফার লেটার ডাউনলোড করার সুযোগ করে দিতে চাইলেন। আমি হাতের ব্যাগটিকে একপাশে রেখে পেছনের ব্যাগের সব কাগজপত্র নামালাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির সব কাগজপত্র। হঠাৎ করে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে সবকিছু দেখালাম। উনি একগাল হেসে বললেন 'ওকে, লেট'স গো...।' তারপর একপাশে চেয়ারে বসে কতক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। পুলিশ অফিসারকে শুধু বললাম: 'আচ্ছা' আমি মনোবুশো স্কলারশিপ পেয়ে জাপান দূতাবাস থেকে ভিসা পেয়েছি। এই ভিসাই কি আমার সব বৈধতার প্রমাণ বহন করে না।' উত্তরে তিনি বললেন, অফার লেটার চেক করা ওনার দায়িত্ব ছিল তাই তিনি তা চেক করলেন। মনে মনে ভাবলাম বাংলাদেশ হয়তো এজন্যই এত অনুন্নত। দেশের একজন বরেণ্য শিল্পপতি আমার এ বেহাল অবস্থা দেখে বলেছিলেন: 'তুমি এদেশের একজন মেধাবী ছেলে, জাপানে যাবে উচ্চশিক্ষা নিতে। পুলিশের কাজ তোমাকে সহায়তা করা। সহায়তা করা তো দূরে থাক, তারা চাইলো তোমাকে একটা বিপাকে ফেলতে। আমি দূর থেকে সবকিছু দেখেছি। যাইহোক, বাবা মনে কিছু করো না। এসব বাংলাদেশে সম্ভব। জাপানে যাচ্ছ, অনেক কিছু শিখবে। মনটা অনেক বড় হবে। পারলে বাংলাদেশের এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কিছু করতে পারলে করিও।' কথাগুলো শেষ করে তিনি অন্যসব

যাত্রীর সঙ্গে বিমানের দিকে চলে গেলেন। ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা ১টা ছুঁইছুঁই করছে।

তারপর বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হলাম। অজু করে দু-রাকাত জোহরের কছর নামাজ পড়ে রওয়ানা হলাম বিমানে ওঠার জন্য। পরপর আরও দু-বার চেক করল এবং অবশেষে উঠলাম থাই বিমানে। ঢুকতেই কতগুলো থাই মেয়ে নমস্কার করে সিটে বসিয়ে দিল। জানালার পাশে আমার সিট।বেল্ট বাঁধলাম বুক বরাবর। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান রানওয়ে দিয়ে সম্ভবত টঙ্গীর দিকে যেতে লাগল। প্রথমে মনে হলো বাসে হয়তো কোথাও যাচ্ছি।না, ধারণাটি ভুল। দু-তিন কি.মি. যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি বিমানটি বিদ্যুৎগতিতে দৌড়াতে লাগল এবং শোঁ করে আকাশে উড্ডয়ন করল। সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। থরথর করে কাঁপছিলাম। না, তেমন ভয় পেলাম না। ধীরে ধীরে বিমানটি আকাশের দিকে উঠতে লাগল আর আমিও স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। চারপাশে লোকজন খুবই স্মার্ট, কেউ গান শুনছে কেউ ম্যাগাজিন পড়ছে। কিন্তু আমি বারবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম-আমার প্রিয় মাতৃভূমির মাটি, গাছপালা, ঘরবাড়ির দিকে। যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল ততই মনে হলো পুরো ঢাকা শহরের মধ্যে দু-একটি খুপরি বিল্ডিং আর চারপাশের নদীগুলো আঙুলের মতো সরু নালা। ধীরে ধীরে বিমান আরও উপরে উঠে গেল। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়েই আছি। একসময় সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। সামনে বিশাল মেঘ, কিছুই দেখা যায় না। মনে হলো নতুন কোনো এক গ্রহে চলে এসেছি। আল্লাহতালার এই মহান সৃষ্টির মধ্যে কতকিছু রয়েছে। কে জানে দূরের ওই মেঘের ওপরে যে আকাশ সেখানে কী আছে? চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কোথায়? খুব কাছে নাকি আরও অনেক দূরে? অদ্ভুত এক অনুভূতি। বুঝিয়ে বলে শেষ করা যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে খাবার এসে হাজির। মুসলিম মিল। বিমানবালা বুঝিয়ে বললেন: ভয়ের কিছু নেই, এই খাবার পুরোটাই হালাল। প্রথমে কিছু খিচুড়ি আর গোশত খেলাম। পাশে আরও ৬/৭ রকমের আইটেম। চামচ দিয়ে একটি মাছের (স্যামন) খাওয়ার চেষ্টা করলাম। বিকট এক দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগল। আরও অনেক রকমের পানীয়। শুধু ওরেঞ্জ জুস খেয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

জীবনের প্রথম বিমানভ্রমণ। মাঝে মাঝে খুশি আবার মাঝে মাঝে ভাবি, মা, ভাইবোন সবাইকে ফেলে কোথায় যাচ্ছি। কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত! মানুষ পড়াশোনার জন্য কতদূরে যায়? এসব ভাবতে ভাবতেই বিমান থাইল্যান্ডের আকাশে চলে এলো। জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম থাইল্যান্ডের সঙ্গে

বাংলাদেশের মিল-অমিল। আমার কাছে মনে হলো যে, থাইল্যান্ডের চাষের জমি চতুর্ভুজাকার, রাস্তাগুলো একদম সোজা। ঢাকা শহরের মতো প্যাঁচানো নয়। বিমান কিছুক্ষণের মধ্যেই থাইল্যান্ডের মাটি স্পর্শ করেছে। তখন ঘড়িতে বিকাল ৪.৩০ কিংবা ৫টা বাজে। ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দর চলে এলাম। বিশাল বড় থাইল্যান্ডের বিমানবন্দর। চলন্ত সিঁড়ি, হরেক রকমের জিনিস। আমার পরবর্তী বিমানযাত্রা রাত ১০টা ৪০ মিনিটে। সুতরাং দীর্ঘ সময়। একটি ট্রলি নিয়ে তাতে আমার ব্যাগটা রেখে সারা থাইল্যান্ড বিমানবন্দর ঘুরে দেখলাম। বিচিত্র রকমের মানুষ। তাদের চেহারা, ধরন, কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র। সারা বিমানবন্দরে এক অ্যারাবিয়ান মহিলাকে দেখলাম যার শরীরে বোরকা আছে। সময়মতো নামাজ পড়ে বাড়ি থেকে দেওয়া রুটি আর গরুর গোশত খেয়ে নিলাম। এখানেও আবার চেক। এবার চেকে আচার নিতে নিষেধ করল। একজন থাই মহিলা এসে আমার ব্যাগ থেকে পানির বোতল আর আচার ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। বিমানে উঠলাম। রাত তখন আনুমানিক ১১টা। চারপাশে অন্ধকার। শুধু দূরে মিটিমিটি আলো জ্বলছে। এবারও জানালার পাশে সিট। তবে অনেক ঠান্ডা অনুভূত হলো বলে জানালার কভার ফেলে দিলাম।

ছোট একটা ঘুম দিয়ে নিলাম। হঠাৎ বিমানবালার ডাকে ঘুম ভাঙল।আনুমানিক রাত ৩টা। এক প্লেট খাবার এনে সামনে দিলেন। লেটুস পাতা দিয়ে মোড়ানো ব্রেডটি খেয়ে বাকিগুলো এমনিতেই রেখে দিলাম। আসলে একরকম বিকট গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। খাবার দেখতে নিউট্রিয়াস মনে হলেও রুচি নেই খাবারের দিকে। এভাবেই এদিক-সেদিক করতে করতে আনুমানিক সকাল ৫টা বেজে গেল। জানালার কভার খুলে দেখলাম চারপাশে কুয়াশা। বিমান আস্তে আস্তে 'কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'-এর কাছাকাছি চলে এলো। বিশাল সাগরের মাঝে কৃত্রিমভাবে তৈরি এই দ্বীপ, যার ওপর বিমানবন্দর। আসলে জাপানে মাটির খুব অভাব। সাগর আর পাহাড়ে ভরা। ৪,০০০ দ্বীপের সমষ্টি জাপান। খুব সকালে বিমান এসে কানসাই বিমানবন্দরে পৌঁছল। ব্যাগ নিয়ে যাত্রীদের পেছনে হাঁটা শুরু করলাম। যেখানে সবাই যাচ্ছে সেখানেই আমি যাচ্ছি। কারণ, জানি না জাপানের ভাষা। বিমান থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে এক লিমুজিন বাসে উঠলাম। সেটা কিছু দূরে এসে থামল। দাঁড়ালাম লাইনে। জাপানি ভদ্রমহিলা আমার পাসপোর্ট, ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখলেন। তিনি আমাকে পাঠালেন অন্য আরেকজনের কাছে। তিনি আমার সব কাগজপত্র ফটোকপি করে এক সেট রেখে দিলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই দেখি বেল্টে এক

এক করে লাগেজ আসছে। আমি আমার লাগেজটা নিয়ে প্রথমেই কুরিয়ার করে দিলাম আমার প্রফেসরের নামে। আর আমি আমার সঙ্গের ব্যাগ নিয়ে দোতলায় উঠলাম। জাপানিরা ইংরেজিতে খুবই দুর্বল। বারবার ইংরেজি বলেও বোঝাতে পারলাম না যে আমি হিরোশিমা যাব। ট্রেনের টিকিট কোথায় কাটব? কোনোরকম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কিছুটা বোঝানোর পর এক ভদ্রমহিলা আমাকে দুটি টিকিট দিলেন। টিকিট নিয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াতেই ট্রেন এসে হাজির। এখানে বলে রাখা ভালো যে, জাপানে আসার কিছুদিন আগে বাকৃবির পশুপালন অনুষদের ড. সুভাষ চন্দ্র স্যারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জাপানি শব্দ খাতায় লিখে এনেছিলাম। ওই শব্দগুলো জাপানে ল্যান্ড করার পর খুব কাজে লেগেছিল।

ট্রেন দেখে মনে হয় না ট্রেন। সামনের দিকটা বকের গলার মতো লম্বা আর চামচের মতো চ্যাপ্টা (বুলেট ট্রেন)। পেছনের বগিগুলো বাংলাদেশের বাসের মতো। উঠে বসলাম। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে ট্রেন এগোতে লাগল। ওসাকা থেকে হিরোশিমা। আনুমানিক ২০০-২৫০ কি.মি. দূরত্ব। কিছুদূর গিয়ে ট্রেনটি থামতেই কিছু যাত্রী উঠল আর কিছু যাত্রী নেমে গেল। জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম- দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন জাপান কেমন? প্রথমবার দেখে আমার কাছে খুব একটা উন্নত মনে হয়নি। আসলে জাপানে বড় বড় বিল্ডিং কম। ছোট ছোট ঘর। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মানুষজনকে দেখেছি দৌড়ে কাজ করতে। এভাবে জাপান দেখা আর স্বপ্নের সঙ্গে জাপানের মিল-অমিল খুঁজতে খুঁজতেই ট্রেন এসে হিরোশিমায় হাজির। আমি ট্রেন থেকে নামলাম। তখন জাপানে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটা। নিচে নামতেই দেখি একজন বাঙালিসহ আমার প্রফেসর মাসায়ুকি সুমিডা দাঁড়িয়ে আছেন। টাই পরিহিত, বয়স আনুমানিক ষাটোর্ধ্ব। একদম হ্যান্ডসাম, স্মার্ট আমার শেনসি (জাপানে শিক্ষককে শেনসি বলে)। তিনি আমার হাত ধরে বিশ্রাম ঘরে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার পরিবারের লোকজনের কথা, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি। অসম্ভব ভালো মানুষ আমার প্রফেসর। একটি সফট ড্রিংকস খেতে দিলেন। আমাকে আশীর্বাদ করে ওই বাঙালির কাছে দিয়ে দিলেন যেন আজকের রাতটা আমি ওনার বাসায় থাকি। ভদ্র বাঙালি আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র, পিএইচডি শেষের দিকে, ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে ওই বড় ভাই তার বাসায় নিয়ে গেলেন।

হিরোশিমার জীবন

গোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া করে কিছুটা ঘুমিয়ে সন্ধ্যার দিকে ওই ভাই আমাকে জাপানের একটি বাজারে নিয়ে গেলেন। কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। কারণ, পরদিন থেকেই আমাকে আলাদাভাবে আমার জন্য বরাদ্দকৃত ইন্টারন্যাশনাল হাউসে থাকতে হবে। নিজের সংসার নিজেরই গোছাতে হবে। ওইদিন কিছু বাজার করে ওই ভাইয়ের বাসায় রাতে থাকলাম। পরের দিন সকালে তিনি গাড়ি দিয়ে আমাকে ইন্টারন্যাশনাল হাউসে দিয়ে গেলেন। দশ তলা বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে উপরের তলায় ১০০৭নং রুমটি আমার। আমার হাতে চাবি দিয়ে দেওয়া হলো। রুমে সবকিছু সাজানো আছে। রুমটি অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ। প্রথমে আমার জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে গেলাম। সুন্দর, চকচকে বাথরুম; কিন্তু আমাদের দেশের মতো পানি ব্যবহার করার জন্য কোনো সুযোগ নেই। হাই কমোডের বাথরুম। মুশকিল! অনেক বিপদে পড়লাম-কী করা যায়। হাতল শাওয়ার দিয়ে কোনোরকম ওইদিনের কাজ শেষ করেছি। বিকালে নিকটস্থ বাজারে গেলাম বদনা কিনতে। সারা হিরোশিমা শহর ঘুরে একটি বদনাও পাইনি। মুসলমানদের প্রচলিত সংস্কৃতি এখানে অনেকটাই অনুপস্থিত। জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে তা এখানে মানা অনেকটাই মুশকিল-তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। জাপান একটি উন্নত দেশ। এখানে এসব সুযোগ-সুবিধা আরও একধাপ এগিয়ে থাকবে-এটাই স্বাভাবিক। মার্কেটের কোথাও কোনো বদনা না পেয়ে খুব অসহায়ভাবে, ক্লান্ত দেহ আর নীরস মন নিয়ে রুমে ফিরে এলাম। ভাবলাম, পাশের রুমের কারো সঙ্গে একটু কথা বলি। জিজ্ঞেস করি কী অবস্থা? কিন্তু দরজায় কড়া নাড়তেই বের হয়ে এলো এক চাইনিজ মেয়ে। হাফ প্যান্ট, শর্ট জামা। বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার একটা পানি রাখার মতো পাত্র লাগবে। ওই মেয়েটি চাইনিজ ছাড়া ইংরেজি কিছুই পারে না। কিছুক্ষণ মনে মনে গালাগাল করে আরেকজনের রুমের দরজায় টোকা দিতেই এক ইংরেজ বের হয়ে এলো। ছেলেটার বয়স আমার মতোই। চুল খাড়া, হাফ হাতা সাদা গেঞ্জি পরা। বেশ স্মার্ট। ওর সঙ্গে কথা বলে মজা পেলাম। ও বেশ ইংরেজি জানে। সে বদনা কী জানে না এবং পায়খানা শেষে পানি ব্যবহার করতে হয় শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। পরে বুঝলাম এটা বাংলাদেশ না। আর কাউকে বলে বে-আক্কেল হয়ে লাভ নেই। এভাবেই দুটি দিন কেটে গেল। এই বিল্ডিংয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যাচেলর ছেলেমেয়েরা থাকে। যার যার রুম তার তার। কেউ কারো সঙ্গে ইচ্ছে

করে দেখা না করলে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন রুচির মানুষ থাকে এখানে।

একদিন সকাল বেলা দরজায় হঠাৎ করে কড়া নেড়ে উঠল। খুললাম। দেখি একজন বাঙালি। খুব খুশি হলাম। ভদ্রলোক আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি অনুষদের শিক্ষক সাঈদ স্যার। জাপানে ফ্যামিলি নিয়ে আছেন বছর তিনেক। সঙ্গে ওনার সুন্দরী স্ত্রী। ভাবি বললেনঃ 'শুনলাম একজন বাঙালি এখানে আছেন। তাই তোমাকে দেখতে ছুটে এলাম।' অবশ্য তারা থাকে আমার এখান থেকে ২ কি.মি. দূরে সাইজো নামক ছোট শহরে। ওদেরকে আমার মনের দুঃখগুলো বলতেই উনি এবং ওনার স্ত্রী একগাল হাসি দিয়ে বললেনঃ 'হাছান, জাপানের কোনো মানুষ পায়খানা বা প্রস্রাব শেষে পানি ব্যবহার করে না।' হাত-মুখ ধোয়ার জন্য যথেষ্ট সুবিধা আছে; কিন্তু পায়খানার জন্য নয় শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর জাপানের মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা, তারাও পানি ব্যবহার করে না। তাহলে কি তারা নোংরা? স্যার বললেনঃ না। এরা সারা বছর টিস্যু ব্যবহার করে অভ্যস্ত। বুঝলাম এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল আমার গ্রাম, যেখানে বড় হয়েছি। কল চাপলেই পানি আর বদনা তো জীবনের একটি সঙ্গী। দু-একদিন পর স্যার ফুলের বাগানে ব্যবহৃত লম্বা সরু নলের বদনার মতো একটি প্লাস্টিকের জিনিস দিয়ে গিয়েছিলেন। এটাই আমার সম্পদ, যা আমি তখন প্রতিদিন ব্যবহার করতাম। স্যারের সেই ক্ষুদ্র উপহার আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি ছিল। স্যারের প্রতি আজীবন ঋণী থাকব।

ইতোমধ্যে আমি ল্যাবে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করলাম। আমার প্রফেসর আমাকে একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। জাপানিরা খুব ভদ্র জাতি। দেখা হলেই মাথা নুয়ে কুর্নিশ করে। আমার ল্যাবে জাপানি, ইন্দোনেশিয়ান ও বাঙালি-এই তিন জাতির মানুষ। যেহেতু আমি জাপানে প্রথম আর নতুন, সেজন্য আমার সব কাজকর্ম যথা: রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, স্টুডেন্ট কার্ড ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করে দেওয়ার জন্য আমার একজন টিউটর আছে। জাপানি ছেলে, তার নাম নিশতানি সান। আমাদের ল্যাবেই মলিকুলার বায়োলজির ওপর মাস্টার্স করছে। প্রত্যেক মনোবুশো স্কলারের জন্য একজন জাপানি টিউটর ঠিক করা থাকে। সে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গেল। ছবি তুলল, গল্প করল ইত্যাদি। সে অবশ্য নিজে দামি গাড়ি চালায়। জাপানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গাড়ি চালায়। সম্ভবত এখানে গাড়ি সস্তা! আমি আমার প্রফেসরসহ প্রত্যেক

ল্যাবমেটকে একটি করে বাংলাদেশের উপহার দিয়েছিলাম। আমার প্রফেসর আমাকে একটি উন্নত জাপানি সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন।

এভাবেই ধীরে ধীরে জাপানের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। শীতের তীব্রতা দিন দিনই বাড়ছে। হিরোশিমায় প্রচুর পাহাড়। বারান্দায় তাকালে পাশের পাহাড়ের ঝোপঝাড় দেখা যায়। দূরের রাস্তাগুলো আইলের মতো মনে হয়। আর মাঝরাতে যখন জ্যোৎস্না উঠে তখন চাঁদের আলো এসে ঠিক আমার ঘরের বিছানায় পড়ে। তখন মনে হয় বাংলাদেশ আর জাপানের মাঝে যতই অমিল খুঁজে পাই না কেন; এই চাঁদ, চাঁদের আলো, মিটিমিটি তারা সবাই এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশে তাদেরকে যেমন দেখেছি এখানেও তেমনই দেখছি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আটটার মধ্যে ল্যাবে আর রাত দশটায় ল্যাব থেকে রুমে। মাঝের ১৪ ঘণ্টা ডিএনএ এক্সট্রাকশন, জিন সিকোয়েনসিং প্রভৃতি মলিকুলার গবেষণা করতেই চলে যায়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কারণ, জাপানিরা অনেক পরিশ্রমী। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কঠিন। এখানে আড্ডা, খোশগল্প নেই বললেই চলে। প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ যত্নের সঙ্গে করে। ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই।

হিরোশিমা আর নাগাসাকির গল্প ছোটবেলায় বইয়ে পড়েছিলাম। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমেই মনে হলো আমি ওখানে যাব, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা বোমা নিক্ষেপ করেছিল। একদিন হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. টসিমাসা আছাহারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের হিরোশিমা শহরের বিখ্যাত হোটেল গ্রামবিয়ায় ডিনারের জন্য দাওয়াত দিলেন। তো আমি আর শহীদুর ভাই সাইজো শহর থেকে ট্রেনে (শহীদুর ভাই হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনোমি বিভাগের প্রফেসর) প্রথমে বম্বডোম (যেই বিল্ডিংয়ের ওপর বোমা পড়েছে) দেখতে গিয়ে ছিলাম। বম্বডোমের সম্ভবত দক্ষিণ পাশে একটি টয়লেট আছে। আমি আর শহীদুর ভাই ফ্রেশ হয়ে অজু করে নামাজ পড়েছিলাম। ফ্রেশ হওয়ার পর ভুল করে আমি আমার মানিব্যাগটা ওই টয়লেটে রেখে এসেছিলাম। নামাজ শেষে আমরা স্ট্রিট কার ধরে হোটেল গ্রামবিয়া'য় যাচ্ছিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর ভাড়া ৫০০ ইয়েনের কয়েন খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, আমি আমার মানিব্যাগটি বম্বডোমের টয়লেটে অথবা অন্য কোথাও ভুল করে রেখে এসেছি। ওদিকে ডিনার শুরু হয়ে যাবে। হাতে সময় কম। শহীদুর ভাইকে বিদায় দিয়ে আমি একাই আবার বম্বডোমে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি টয়লেট বন্ধ। অনেক

দৌড়াদৌড়ি করে সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। ব্যাগটি পেলাম না। আমি খুব ঘেমে গিয়েছিলাম। কারণ, ব্যাগের ভেতর টাকা, স্টুডেন্ট আইডি কার্ড, ব্যাংক কার্ড, ইন্টারন্যাশনাল হাউসের রুমে ঢোকার সেন্সর কার্ড ইত্যাদি ছিল। গত্যন্তর না পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পরে আমি আবার স্ট্রিট কার ধরে হোটেল গ্রামবিয়ায় ডিনারে অংশগ্রহণ করি। অনুষ্ঠান শেষে আমরা হিরোশিমা থেকে সাইজোয় চলে আসি। শহীদুর ভাই ওনার ইকোনো প্রাইভেট স্টুডেন্টদের ডরমিটোরিতে চলে যান। আমি ইন্টারন্যাশনাল হাউসে চলে আসি। কিন্তু রুমে ঢুকতে পারছি না। জাপানি বুড়ো গার্ডকে অনেক রিকোয়েস্ট করে স্পেশাল ওয়েতে দরজা খুলে সেদিন আমি রুমে ঢুকি। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। পরের দিন সকাল বেলা ইন্টারন্যাশনাল হাউসের নিচতলা অফিসে যাই। ভদ্র জাপানি মহিলা ভালো ইংরেজি জানেন। আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। সে হিরোশিমার বম্বডোমের অফিসে ফোন দেয়। তারা অনেকক্ষণ জাপানি ভাষায় কথা বলে। পরে ভদ্রমহিলা জাপানি ভাষায় একটি চিঠি লিখে আমাকে দেয় এবং বলে যে, তুমি দ্রুত বম্বডোমের অফিসে গিয়ে এই চিঠি দেখাবে। আমি চিঠি নিয়ে ট্রেন ধরে হিরোশিমা শহরে চলে যাই। বম্বডোমের অফিসে গিয়ে চিঠিটি দিই। অফিসার আমার হাতে আগের দিন হারানো মানিব্যাগটি ফিরিয়ে দেন। আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়লাম। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আমি আর মানিব্যাগটি পাব না। জাপানিদের সততা দেখে মুগ্ধ হই।

হোটেল গ্রামবিয়ার ডিনার পার্টিতে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম প্রেসিডেন্ট ড. টসিমাসা আছাহারার সঙ্গে লেখক

বম্বডোম দেখার পর মনে হয়নি যে, এখানে কোনোদিন বোমা পড়েছিল। কারণ, চারপাশে অত্যন্ত সুন্দর গোছানো রাস্তা, সবুজের সমারোহ আর পাশের বয়ে চলা নদীটি যেন আবহমান কাল ধরে হিরোশিমার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যেই বিল্ডিংয়ের ওপর প্রথম বোমা পড়েছিল, সেটা দেখতে গম্বুজ আকৃতির। এখন শুধু স্টিলের তৈরি একটি স্ট্রাকচার রয়েছে। উপরে কোনো ছাদ নেই, নিচের অংশটুকুতে সিমেন্টের দেওয়াল রয়েছে। বর্তমানে দেখতে ছাতার মতো একটি অট্টালিকা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বিল্ডিংটির নিচে এই ধ্বংসযজ্ঞের কথা জাপানি ভাষায় লেখা আছে। দৈনিক যে হাজার হাজার দর্শনার্থী বিল্ডিংটি দেখতে আসেন, তারা একবার হলেও স্তম্ভের ওপর এই লেখাটুকু পড়েন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানি আত্মসমর্পণ করল। জাপান তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। বারবার সতর্ক করার পরও জাপানি রাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তখন ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে 'লিটল বয়' নামক একটি অ্যাটোমিক বোমা নিয়ে হাজির ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পল ওয়ারফিল্ড টিটেসি জুনিয়র। 'এনোলা গে' নামক বিমান থেকে 'লিটল বয়' অ্যাটোমিক বোমাটি হিরোশিমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো হিরোশিমা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হিরোশিমার ওপর দিয়ে আকাশে উঠতে থাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হয়ে যায় কয়েক লাখ নিরীহ মানুষ। মারা যায় এক থেকে দেড় লাখ মানুষ। জাপান ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ আমেরিকার পার্ল হারবারে আক্রমণ না করলে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে এত মাশুল দিতে হতো না।

অ্যাটোমিক বোমার রেডিয়েশনের প্রভাব অনেক বছর ছিল। যারা বেঁচে ছিল, তাদের অনেকেরই হাত-পা ছিল না। কেউ কেউ আবার রেডিয়েশনের গ্লানি নিয়ে বহু বছর বেঁচে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঁচে যাওয়া একজন প্রবীণের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। লোকটি আমাকে বলেছিল যে, তখন তিনি স্কুলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বিশাল আকৃতির ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যান-মনে হচ্ছিল যেন তিনি ধোঁয়ার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা। সেখান থেকে দৌড়ে কোনোরকম একটি দালানের ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। এ ঘটনার পর তার বাবা সাইজো শহর থেকে ৩০ কি.মি. সাইকেল চালিয়ে এসে তাকে হিরোশিমা শহর থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথমদিকের জীবন খুবই বিভীষিকাময় ছিল। দেহে রেডিয়েশনের প্রভাব ছিল। কেউ তাকে বিয়ে করতে চায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি

মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। বর্তমানে তার কয়েকজন ছেলেমেয়ে আছে। এখন তিনি অন্য দশজন মানুষের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো অসুবিধা নেই। তবে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে পড়লে এখনো তিনি আঁতকে ওঠেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত ও নিহতদের জাপানিরা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। সমাজে তাদের আলদা স্থান আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

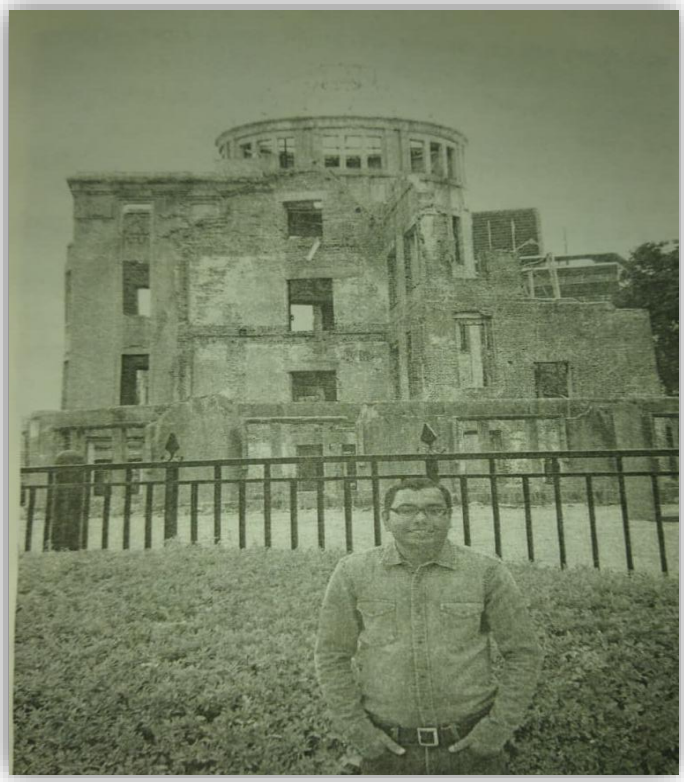

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল সোয়া আটটায় হিরোশিমার যেই বিল্ডিংয়ের ওপর অ্যাটোমিক বোমা ফেলা হয়েছিল। তার সামনে লেখক

বিধ্বস্ত জাপানকে আজকের এই আধুনিক ও উন্নত জাপানে তিলে তিলে গড়ে তোলার পেছনে প্রবীণদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় রয়েছে। তখনকার জাপানিদের মধ্যে জিদ কাজ করত। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করত। তাঁরা সবাই মিলে আজকের জাপান উপহার দিয়েছে এই প্রজন্মের তরুণদের।

সবাই স্বীকার করে যে, আজকের এই জাপানি তরুণরা তাঁদের পূর্বসূরিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী ও বেশি আরামপ্রিয়। আজকের তরুণ-তরুণীরা আমেরিকানদের অনেক ফলো করে। যেটা এখনো কোনো কোনো বৃদ্ধ

জাপানি ভালো চোখে দেখে না। কেনই বা দেখবে? এখনো অনেক আমেরিকান বেইস জাপানে আছে এবং অনেক আমেরিকান সৈন্যকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে-পরাতে হয়। জাপানের প্রতিরক্ষা সিস্টেম দুর্বল। পত্রিকায় মাঝে মাঝে খবর হয়, ওকি নাওয়াতে কখনো কখনো আমেরিকান সৈন্যদের লালসার শিকার হতে হয় জাপানি তরুণীদের!

হিরোশিমার বম্বডোম পার হয়েই 'পিস মেমোরিয়াল পার্ক'। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত মানুষের চুল, জুতা, মোজা কিংবা কাপড়ের অংশবিশেষ রাখা হয়েছে। একটি পাথরকে কাচের বক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে যার ভেতর এখনো রেডিয়েশনের ক্রিয়া বিদ্যমান। জিনিসগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, এগুলো যে কেউ দেখলে ভয় পেতে পারে কিংবা কেঁদে উঠতে পারে। ৭৫ বছর পর আজকের হিরোশিমা এখন অনেকটাই ভিন্ন। বম্বডোমের পাশেই বয়ে চলেছে নদী। নদীর পানি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। বিনোদনের জন্য দু-একটি ছোট স্পিডবোট চলে। নদীর পাড়ে সবুজের সমারোহ। চারপাশে পাখপাখালির ডাক। সুন্দর নির্মল সুবাতাস আর স্বচ্ছ আকাশের নিচে বম্বডোম দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, এখানে এক সময় ইতিহাসে বিরল হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটেছিল। সভ্যতার কালো থাবা পেরিয়ে হিরোশিমা আজ দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর শান্তি আর ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে।

আমার বাসা ইন্টারন্যাশনাল হাউসের জানালা দিয়ে দূরের পাহাড়, সরু রাস্তা দেখতাম। খুবই ভালো লাগত। বায়োস্ফিয়ার সায়েন্স ফ্যাকাল্টির পোলট্রি ফার্মের পাশেই ঘোড়া পরিচর্যা ও রাইড ক্লাব ছিল। একদিন খুব সকালে বরফে আচ্ছাদিত ওই এলাকায় যাই। সুন্দর একটি জাপানি মেয়ে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা। দেখি খুব সুন্দর ও তেজি একটি ঘোড়া দৌড়ায়। আমি ভয়ে ভয়ে কাছাকাছি গেলাম। ওখানের প্রধান ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম। উনি আমাকে বললেন যে, সাধারণত বিদেশিরা এই ক্লাবে এলাও না। কারণ, আগে একজন বিদেশি এই ক্লাবের মেম্বার ছিল। সে ঠিকঠাক মতো সব কাজ করতে পারেনি। আমি মন খারাপ করে ওখান থেকে চলে এলাম। নতুন এই জাপানির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দের মাঝে এক ধরনের ভীতি তৈরি হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঁচে যাওয়া একজন জাপানি প্রবীণের সঙ্গে হ্যান্ডশেক অবস্থায় লেখক

কখনো কখনো ইউমি (শপিং মল) টাউনে বাজার করতে যেতাম। ইউমি টাউনকে খুব ভালো লাগত। কারণ, ঢুকেই একটু এসির বাতাস পেতাম। ফলমূল, শাকসবজি, তেল, চিনি ইত্যাদি কিনতাম। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এক ফালি তরমুজ ৩০০ ইয়েন দিয়ে কিনে হাপুসহুপুস খেতাম। খুব ভালো লাগত। কখনো কখনো লাঞ্চ ঠিক সময়ে করতে না পারলে বেনতু (খাবার) কিনার জন্য দৌড়ে ল্যাব থেকে ইউমি টাউনে যেতাম। ইউমি টাউনের দোতলায় হিয়াকু ইয়েন (১০০ ইয়েনের) দোকানে গিয়ে কত রকমের বিচিত্র জিনিস কিনতাম। ৮% ট্যাক্সে ১০০ ইয়েনের জিনিস ১০৮ ইয়েনে বিক্রি হতো। কখনো কখনো সাবান, ব্রাশ, ছোট ছোট চায়ের কাপ ইত্যাদি কিনতাম। বাঙালি বলে কি না, এখানে জিনিসপত্র একটু সস্তা মনে হতো বলে অনেক কিছুই কিনে ফেলতাম। তবে শেষমেশ ব্যবহারের পরে মনে হতো এগুলো সত্যিকার অর্থে জাপানি কোয়ালিটি মেইনটেন করে না। একদিন একটি ঘটনা ঘটল। বাসায় নিজে রান্না করি বলে আমার তেলের দরকার। দৌড়ে গিয়ে বাংলাদেশের সরিষার তেলের মতো রং বিধায় কিনে এনে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করতেই দেখি ওটা আসলে তেল নয়, এক ধরনের জাপানি পানীয় (চা)। কখনো কখনো সময় পেলে পুরো ইউমি টাউন আমি ঘুরে দেখতাম। আমার কাছে মনে হয়, ইউমি টাউনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কাপড় বেশি পাওয়া যায়। বিশেষ করে মেয়েদের প্যান্ট, শার্ট, ব্রা, ইনার, জুতা-মোজা সত্যিই

অসাধারণ। ইউমি টাউনের নিচতলায় ৪০০ ইয়েন দিয়ে ইন্সট্যান্ট রান্না করা গরম নুডলস খেতাম। ওটার স্বাদ আজও আমার মুখে লেগে আছে।

ইন্টারন্যাশনাল হাউসে প্রথম ছয় মাস থাকা যায়। পরে বাসা পরিবর্তন করতে হয়। তো নতুন বাসার জন্য দরখাস্ত করলাম। সাইজো শহরের সান স্কয়ারের ৬১০ নম্বর রুম পেয়ে গেলাম। রুমেও থাকতে শুরু করলাম। ছয় তলার এই রুমটি আমার ভালোই লাগত। ৬ ও ৭ তলার মাঝে সিঁড়ির ফাঁকা জায়গায় মাঝে মাঝে আজান দিয়ে নামাজ পড়তাম। আমি একা নই, সঙ্গে থাকত আরেফিন ভাই (বর্তমানে চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর)। সাইজো শহরে বছরে একবার মদের উৎসব হতো। আমরা ঘুরে বেড়াতাম। ভালোই কাটত অতীতের দিনগুলো। ছোট ছিলাম বলে অনেক আদর পেতাম। রঞ্জনদা (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) এবং রতনদার (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) সঙ্গে অনেক সময় পার করেছি। তাদের সঙ্গে প্রায়ই খোশগল্প করতাম। বিশেষ করে রতনদার টোকিও থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসা মিষ্টি আর রুটির কথা ভোলার নয়। সান স্কয়ারের পাশেই সাইজো প্লাজা। ওখানে তিন তলায় মেয়েদের ব্যায়ামের ক্লাস হতো। আমি আমার রুম থেকে অবাক হয়ে এগুলো দেখতাম। জাপানি মেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রতি কত সচেতন! ভালো লাগত।

সাইজো প্লাজায় যখন ঢুকতাম তখন মনে হতো আমার নিজের গ্রামে ঢুকেছি। সবকিছু খুব আপন মনে হতো। এত সুন্দর করে সাজানো জিনিস। বিশেষ করে কফি খাওয়ার জায়গাটা অনেক সুন্দর। ওখানে বসে চা-কফি খেতাম। জায়গাটি খুবই আকর্ষণীয়। শুনেছি, জাপানের মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্তরা এখানে আসেন। কারণ, খাবার কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্রের কোয়ালিটি খুব ভালো। দোতলার একপাশে কয়েকটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ছিল। নামে ইন্ডিয়ান হলেও কিছু নেপালি সেই দোকানগুলো চালাত। খুব মজার ব্যাপার হলো, কখনো কখনো প্রয়োজন হলে সাইজো প্লাজায় টয়লেটে যেতে হতো। টয়লেটগুলো এত সুন্দর ও পরিষ্কার যে, মনে হতো এখানে বসে ভাত খাওয়া যাবে। সাইজো প্লাজা আমার অন্যতম একটি পছন্দের জায়গা।

ফুজি গ্রান্ডেও মাঝে মাঝে যেতাম। যেহেতু এটি একটু দূরে, সেহেতু কম যাওয়া হতো। বিশেষ করে হুমায়ুন ভাই, আলম ভাই কিংবা মনিষদার বাসায় গেলে ফুজি গ্রান্ডে একটু ঢু মেরে আসতাম। কখনো কখনো ভালো মানের কাপড়চোপড় কিনতাম। খুব মুশকিল ছিল ওই সব কাপড়-চোপড় ছোট, মাজারি, বড় প্রভৃতি সাইজের ছিল। কখনো কখনো আমার সাইজের কাপড় কিনলেও লম্বায় একটু

বেশি হতো বলে যদি কাটাতে চাইতাম, ওইটার পারিশ্রমিক এত বেশি ছিল যে, মূল কাপড়ের দামের চেয়ে ওইটুকু কাজের দাম বেশি পড়ত। এটা আসলে পুরো জাপানেরই চিত্র!

ইউনিকু জাপানের অন্যতম কাপড়ের ব্র্যান্ড। শিয়াকশোর (পৌরসভার) পাশের রাস্তা দিয়ে কতবার সেখানে গিয়েছি আর কত যে শীতের মোজা, প্যান্ট, ট্রাউজার এবং গেঞ্জি কিনেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মজার ব্যাপার হলো, ইউনিকুর অনেক কাপড় বাংলাদেশ থেকে যায়। তা আমি আগে জানতাম না। একবার বাংলাদেশে যাব, আমার বড় ভাইয়ের জন্য একটা জাম্পার কিনলাম। খুব যত্ন করে বাংলাদেশে নিয়ে এলাম। অনেক লোক ডেকে ছবি তুলে ঘটা করে ভাইকে জাম্পারটি উপহার দিলাম। প্যাকেট খুলে ভাইজান দেখলেন কাপড়ের এক কোনায় স্টিকারে লেখা 'মেড ইন বাংলাদেশ'। তখন বুঝলাম আমাদের দেশের গার্মেন্টসের পাওয়ার কত।

সাম্প্রতিক সময়ে নিম্নবিত্তদের জন্য 'এভরি' নামক একটি শপিং মল চালু হয়েছে। এটায় মোটামুটি চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি গ্রোসারি পাওয়া যায়। এখানে তুলনামূলকভাবে সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাঙালি, ইন্ডিয়ান, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান এবং চাইনিজদের জন্য খুবই পপুলার একটি জায়গা। চাইনিজ মেয়েরা বড় বড় বাঁধাকপি কিনে এভরির পাশে পড়ে থাকা কার্টনের মাঝে রেখে সাইকেলের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত। শুনেছি, এরা এগুলো খেয়ে কম খরচে জীবনযাপন করে। হাফপ্যান্ট পরা সাদা চামড়ার ওইসব চাইনিজ মেয়ের ত্বকে কিছুটা হলেও অপুষ্টির ছাপ পাওয়া যেত।

চাইনিজদের নিয়ে আমার দু-একটা ছোট অভিজ্ঞতা আছে। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার শুরুর দিকে এক চাইনিজ মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, জাপান ও চায়নার কানজির মিল থাকার কারণে চাইনিজরা অন্য যেকোনো বিদেশির তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি জাপানি ভাষা রপ্ত করতে পারত। মেয়েটি খুব ভালো জাপানি ভাষা পারে। সে আমাকে জাপানি শেখাবে আর আমি তাকে ইংরেজি শেখাব। মেয়েটি চমৎকার সুন্দর করে কথা বলে। মাথায় একটা হ্যাট পরত। মুখটা গোলগাল, ঠোঁট দুটি লাল। একটু হলদে-লালচে সুন্দর দুটি গাল। কালো ভ্রু, শর্ট চুল। ছেলেদের মতো টাইট প্যান্ট পরত আর ছিল ফ্ল্যাট জুতা। চশমা তো তার ছিলই। ইউনিভার্সিটির ভেতরে রেস্টুরেন্টের ফাঁকা টেবিল-চেয়ার ছিল। ওখানে সপ্তাহে একবার সে আমাকে জাপানি ভাষা আর আমি তাকে ইংরেজি শেখাতাম। হিরোশিমায় প্রথমদিকের

দিনগুলো খুব আবেগে কাটিয়েছি। এভরিতে বাজার করার সময় ওই চাইনিজ মেয়েদের জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখলে আমার সেই চায়নিজ মেয়ের কথা মনে পড়ত। সে এক বাপের এক মেয়ে ছিল বিধায় তার পোশাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের ছাপ ছিল। সেই মেয়েটি আর এভরি থেকে বাজার করে ফিরে যাওয়া চাইনিজ মেয়েদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আমাকে ভাবিয়ে তোলে যে, চাইনিজদের সমাজেও আমাদের মতো ধনী-গরিব বিরাট বৈষম্য বিরাজমান।

হিরোশিমা টু সাংহাই, সাংহাই টু কুনমিং ফ্লাইটে অনেক চাইনিজকে দেখেছি। আচার-ব্যবহার মোটামুটি মানের। চাইনিজদের আমি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতাম। কিন্তু একবার সাংহাই টু কুনমিং যাওয়ার পথে এক রুক্ষ স্বভাবের চাইনিজের সঙ্গে দেখা। সে সম্ভবত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। বিমানের ক্রুর সঙ্গে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে। সান স্কয়ারে ৬১০ নম্বর রুমে থাকার সময় প্রায়ই চাইনিজ স্বামী-স্ত্রীর মারামারি পরোক্ষভাবে অবলোকন করেছি। আরেকটা বিষয়, একদিন লিফটের জন্য সান স্কয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি দুটো চাইনিজ ছেলে লিফটের সামনে এসে পা দিয়ে সুইচ অন করছে। এগুলো দেখে চাইনিজদের অন্তর্নিহিত স্বভাবই চোখে ভেসে ওঠে। একবার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় পেপার প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েও চাইনিজ ছেলের সঙ্গে দেখা। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে দেখলাম চাইনিজ মার্কেট নামে এক দোকান। সবকিছুই পাওয়া যায়-সুই-সুতা থেকে শুরু করে কাপড়চোপড় সবকিছু। এই তো সেদিন, মতিঝিলের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনেও এক চাইনিজ মেয়েকে দেখলাম ফেরি করে মোবাইল সেট বিক্রি করছে। চাইনিজরা কোথায় নেই বলা মুশকিল।

হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির আমার ল্যাবের পূর্ব পাশের রাস্তা ক্রস করলেই একটা বিরাট পুকুর। এর একপাশে বসার সুন্দর সুন্দর বেঞ্চ আছে। ওখানে প্রায়ই বসে থাকতাম। প্রকৃতিকে উপভোগ করতাম। চারপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝে একটা করুণ নীরবতা বিরাজ করত। আমার খুব ভালো লাগত। যখনই মন খারাপ হয়ে যেত, তখনই আমি ওখানে যেতাম। একখণ্ড মুক্ত আকাশ আমাকে খুব বিচলিত করত। নিজেকে তখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনে হতো। মনে হতো উড়ে চলে যাই নিজ গ্রামে মায়ের কোলে। মনে হতো শৈশবের দুরন্তপনা। মনে হতো কানামাছি, দাড়িয়া, মার্বেল আর ঢাংগুলি খেলার কথা। পহেলা বৈশাখে ঘুড়ি ওড়ানো, জিলাপি আর খই খাওয়ার কথা। ছোট ছোট বেলুন আর নানা রকমের বাতাসার (এক ধরনের মিষ্টি) কথা। কিছুক্ষণের জন্য হলেও হারিয়ে যেতাম নিজ গ্রামে। সাঁতার কাটতাম বিলে, শালুক-শাপলা তুলতাম, মাছ ধরতাম,

মারামারি করতাম, চুরি করে ডাব কিংবা আম কুড়াতাম। শৈশবের সোনালি দিনগুলো আমাকে খুবই আবেগাপ্লুত করত। মিস করতাম নিজ গ্রামের মাটি, আলো-বাতাস আর বিস্তীর্ণ জুড়ে সবুজ মাঠকে। মিস করতাম মাটির রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা। মিস করতাম হাছনা, রিভা, শান্তা, জেমি, মাছুম, কামরুল, প্রান্ত আরও অনেক বন্ধুর কথা। মিস করতাম কালাম স্যারের বেতের পিটুনি আর জাহাঙ্গীর স্যারের কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ইতিহাস মুখস্থ করার কথা। মিস করতাম লুৎফর স্যারের পিটি আর কানে ধরে ওঠবস করানোর কথা। মিস করতাম মৌলবি স্যারের কড়া বেতের পিটুনির কথা। মিস করতাম সৈয়দেরগাঁয়ের সিরাজের কাছ থেকে চার আনা পয়সার আইসক্রিম কিনে খাওয়ার কথা। মিস করতাম স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ভূঞা বাড়ির কামরাঙা, জলপাই আর তেঁতুল কুড়ানোর কথা। মিস করতাম হাতিরদিয়া বাজারের তানিয়া

জাপানি ভাষায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় লেখক ও অন্য বিদেশি ছাত্রছাত্রী

এন্টারপ্রাইজের দিস্তা কাগজের সোঁদা গন্ধের কথা। মিস করতাম জেমির সঙ্গে ঝগড়ার কথা, গোপনে জেমির খাতায় কবিতার লাইন লিখে রাখার কথা আর সাঈদ স্যারের বেতের পিটুনির কথা। দূরের সেই শকুন, চিল, বক আর কাঠবিড়ালির মতোই হন্যে হয়ে অতীতকে খুঁজতাম। ফিরে পেতাম একধরনের

স্বস্তি আর সাহস। সেটুকু পুঁজি করে আবার ল্যাবে যেতাম। সেই ডিএনএ এক্সট্রাকশন আর পিসিআর মেশিনের সঙ্গে চলত দিনের বাকি অংশের কাজ। এভাবেই চলছিল আমার জাপানের দিনগুলো।

ইন্টারন্যাশনাল হাউসে থাকার সময় থেকেই 'জ' আদ্যাক্ষরের বাঙালি মেয়েটির সঙ্গে আমার ভালো পরিচয়। সদ্য বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ঢাকার মিরপুরের এই মেয়েটি আমার সঙ্গেই মনোবুশো স্কলারশিপ পেয়ে জাপানে গেল। ও থাকত ছয় তলায় আর আমি দশম তলায়। বিদেশের মাটিতে দেশের কাউকে পেলে খুব আপন মনে হয়। এক ধরনের বাঙালি আবহ তৈরি হয়। নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। শুরুর দিকে নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে একসঙ্গে কথা বলতে হতো। কারণ, আমি আর সে দুজনই ছিলাম একমাত্র বাঙালি ওই ডরমিটোরিতে। নতুন হওয়ার সুবাদে আমরা প্রায়ই নানারকম ঝুট-ঝামেলায় পড়তাম। বাজার কোথায়, তরকারি কী কিনব, কী খাব ইত্যাদি। সে আমার চেয়ে এক বছরের বড় হলেও রুচি, চিন্তাচেতনায় আর বিশ্বাসে খুব মিল ছিল। তবে সে অনেক স্মার্ট ছিল। টাইট জিন্সের সঙ্গে হিজাব পরত। মাঝারি গড়নের মেয়েটির গায়ের রং ছিল ধবধবে সাদা। তার মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল। সে অনেক ট্যালেন্টও ছিল। ফ্যাকাল্টিতে যাওয়ার পথে পাশাপাশি হেঁটে আমরা অনেক গল্প করেছি। সে অনেক ভদ্র ও মিষ্টি স্বভাবের ছিল।

তো বাসা পরিবর্তন করে আমি সাইজোর সান স্কয়ারে ওঠার দু'সপ্তাহ আগেই সে সান স্কয়ারে উঠেছিল। সম্ভবত আট কি নয় তলায় ছিল তার রুম। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে পড়ত। প্রায়ই সিমুলেশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলত। আমি বায়োলজির স্টুডেন্ট বিধায় এগুলো খুব কম বুঝতাম। দু-একবার তার বাসায় দাওয়াতও খেয়েছি। একদিন সে ফোন করে বলল: হাছান ভাই, চলেন বসে গল্প করি। তখন আনুমানিক বেলা ১১-১২টা। আমার ল্যাবের কাছে রাস্তার পাশে কিছুটা নিচে একেবারে প্রকৃতির এক অপরূপ দৃশ্য। স্থায়ীভাবে দুটি বেঞ্চ বসানো ছিল। ওই বেঞ্চে প্রায়ই আমি একা একা বসে থাকতাম। তো ওইদিন সে আমাকে বলল, চলেন নদীর পাশ দিয়ে হাঁটি। সে সব সময় আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করত। হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির ওই নদীর (অনেকটা বাংলাদেশের খালের মতো) পাশ দিয়ে অনেক সরু পথ দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে হেঁটেছিলাম। হালকা বাতাসে তার গা থেকে কিছুটা মিষ্টি সুঘ্রাণ পেয়ে আমি হাওয়ায় দোল খেতেছিলাম। হেঁটে হেঁটে ব্রিজের নিচ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এসেছিলাম। আসলে ওইদিন আমরা দুজন জানতাম না কেন হেঁটেছিলাম, কেন এত লম্বা সময়

কথা বলেছিলাম। জীবন এমনই হয়। না-জানা অনেক কিছু জীবনে বয়ে যায়। যার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। তার সঙ্গে একটি পবিত্র, মিষ্টি ও মধুর সম্পর্ক ছিল। সে যথেষ্ট ধার্মিক ছিল। হিরোশিমায় মসজিদে সে অনেক ডোনেশন দিয়েছিল। শুনেছি, সে এখন কানাডায় স্বামী-সংসার নিয়ে খুব ভালো আছে। মেয়েটি জীবনে অনেক বড় হোক-সেই দোয়া রইল।

ছুটি পেলে কখনো কখনো দৌড়ে সাইজো রেলস্টেশন পার হয়ে কবরস্থানের পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওপরে পার্কে উঠতাম। ওখানে অনেক সুন্দর জায়গা ছিল। রাস্তাঘাট এত পরিষ্কার যে, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। ভেতরে জাপানি ট্র্যাডিশনাল বার-বি-কিউ করার সিস্টেম আছে। কখনো কখনো আমরা বাঙালিরা ওখানে গিয়ে কাঁচা গোশত কিছুটা পুড়িয়ে খেতাম। ভালো লাগত। কত মানুষকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুল কিংবা নানা ধরনের গিফট দিতাম। যখন একা একা ব্যায়ামের জন্য ওখানে যেতাম, তখন শুধু হাঁটতাম আর চারপাশে দেখতাম। জাপানের সবকিছু দেখার মতো। এত পরিপাটি আর সাজানো-গোছানো জায়গা কোথাও দেখিনি।

আমার পোস্ট ডক্টরালকালে আমি সাইজো শহরের পাশে জিকের কারাচে রতন নামক দোতলার এ-২০৩ নম্বর রুমে থাকতাম। বাসাটি একেবারে জাপানি স্টাইলে শুধু ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি করা। বাসার মালিক হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল কি না, সেটা জানা না গেলেও তারা স্থানীয় হাউস রেন্ট দালালদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। এসব দালাল হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা স্টাফদের কাছে এসব বাসা ভাড়া দিয়ে থাকে। এরা দালাল হলেও বাংলাদেশের দালালদের মতো বাটপাড় নয়; বরং কথায় ও কাজে শতভাগ সৎ। আমার পাশে তানভীর ভাই (বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত), তৌফিক ভাই (বর্তমানে ঢাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত) ও মনসুর ভাই (বর্তমানে কানাডা প্রবাসী) থাকত। বাসাটির পাশে প্রচুর ধানখেত ছিল। এই সমতল ভূমিটুকুতে প্রফেশনাল জাপানি কৃষকরা ধান চাষ করত। একজন জাপানি একাই জমি চাষ থেকে শুরু করে ধান লাগানো ও হার্ভেস্ট সবকিছু করত। অবশ্য এ কাজে তারা আধুনিক সব মেকানাইজড যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। আমি এমনও দেখেছি যে, তারা রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছোট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কীটনাশক জমিতে ছিটিয়ে দিত। শরৎকালে যখন ধানখেতগুলো সমানভাবে বড় হয়ে সবুজ হয়ে যেত, তখন পুরো মাঠটিকে বাংলাদেশের কোনো একটি বিল বলে মনে হতো। এই ধানখেতের পাশ দিয়েই

আমি রেগুলার সাইকেল চালিয়ে বাসা থেকে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতাম। মাঠের মাঝখানে যখন পৌঁছতাম তখন মুক্ত বাতাসে বড় করে শ্বাস নিতাম। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। আমার অজানা স্বপ্নগুলো আকাশে উড়ে বেড়াত। আমার পোস্ট ডক্টরাল করার সময়গুলো এভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

২০১২ সালের ২৩ মার্চ পিএইচডি সার্টিফিকেট গ্রহণের পর হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. হিরোনরি ডেগুচির সঙ্গে লেখক

পোস্ট ডক্টরাল শেষ হওয়ার পর ২০১৫ সালে আমি হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি। তখন আমি কারাচে রতন থেকে

হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ডরমিটোরির দ্বিতীয় বিল্ডিংয়ের ৪০৩নং বাসায় স্থানান্তরিত হই। বাসাবদলের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানে আসা অমৃত সানা হিন্দু ছেলেটি আমাকে অনেক হেল্প

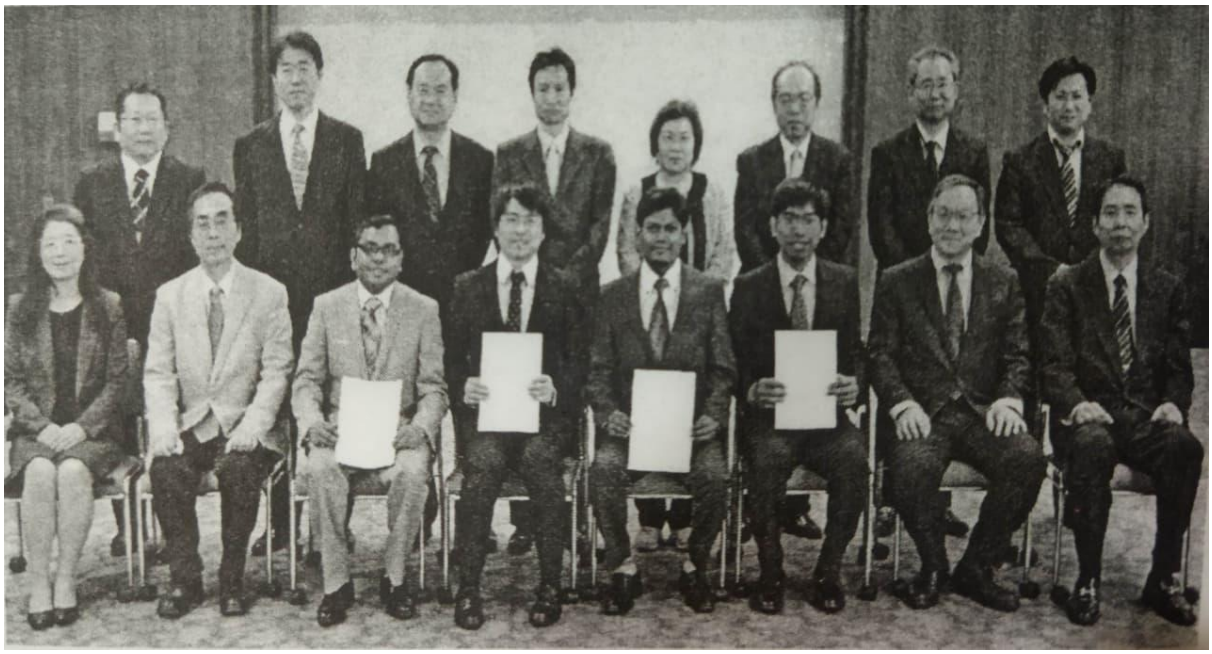

পোস্ট ডক্টরাল হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অন্যান্য প্রার্থী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে লেখক

করেছিল। চার তলার এই বাসাটা অদ্ভুত সুন্দর। একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে লোকালয়। আমার বাসাটি ঠিক পাহাড়ের ঢালুতে আর তার পরেই সরু পিচের রাস্তা। পাহাড়টা আমার খুব ভালো লাগত। কারণ, এই পাহাড় হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি এবং আমার বাসার মাঝে একটি দেওয়াল তৈরি করেছে। এখানে আছে শত রকমের গাছগাছালি, পাখপাখালি আর অজস্র ঝিঁঝি পোকা। পাখপাখালি আর ঝিঁঝি পোকার ডাক গ্রীষ্মের বিকেলটাকে অন্যরকম করে তোলে। এগুলো নিস্তব্ধতার মাঝে এক ধরনের আবহ তৈরি করে। আমি এগুলো এনজয় করি। ভয় পাই না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পাহাড়ে কোনো বাঘ-ভল্লুক থাকে না। খুবই নিরাপদ একটি পাহাড়। সবুজের সমারোহ আর সুনসান নীরবতা। কতদিন কত অজানা কথা এলোমেলো ভেবে এই পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছি। কখনোই মনে হয়নি এটি জাপান। সব সময়ই জায়গাটিকে উপভোগ করেছি। সবুজের সমারোহে জাপানের এই ছোট ছোট পাহাড় নিজের মধ্যে এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি করত।

মাঝেমধ্যে আমি দৌড়াতাম। বাসা থেকে দৌড়ে দৌড়ে হিরোশিমা ইন্টারন্যাশনাল প্লাজার (জাইকা সেন্টার) কাছের পুকুরপাড়ে গিয়েছি। পুকুরের চারপাশে চক্কর দিতাম। অদ্ভুত সুন্দর পুকুর। চারপাশে ব্যায়াম করার জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আছে। অনেক জাপানি এখানে এসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরত কিংবা পার্টি পেতে লাঞ্চ করত। এগুলো আমাকে প্রচুর নাড়া দিত। আমি অবাক হয়ে এগুলো দেখতাম। বিশেষ করে পুকুর থেকে আমার বাসায় আসার মাঝের জায়গাটুকু সত্যিই সুন্দর। দুপাশে বিশাল পাহাড়, মাঝে সরু পথ। অপরদিকের রাস্তাটাও ভালো লাগত। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অনেক ওপরে একটি শান্ত, সুন্দর অবতল রাস্তা এঁকেবেঁকে উপরে উঠত। মাঝে মাঝে আমি ওখানে যেতাম। উপরে উঠে দেখি কিছু গাড়ি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করে বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রীষ্মকালে এখানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অনেক সুন্দর একটি জায়গা। কেউ ডিস্টার্ব করে না। পাশেই ১০০ কিংবা ২০০ ইয়েন দিয়ে ড্রিংকস কেনার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আছে। ওখান থেকে রাস্তাটি সোজা নিচে চলে গেছে ইকুনোমিয়া ডরমিটোরির সামনে।

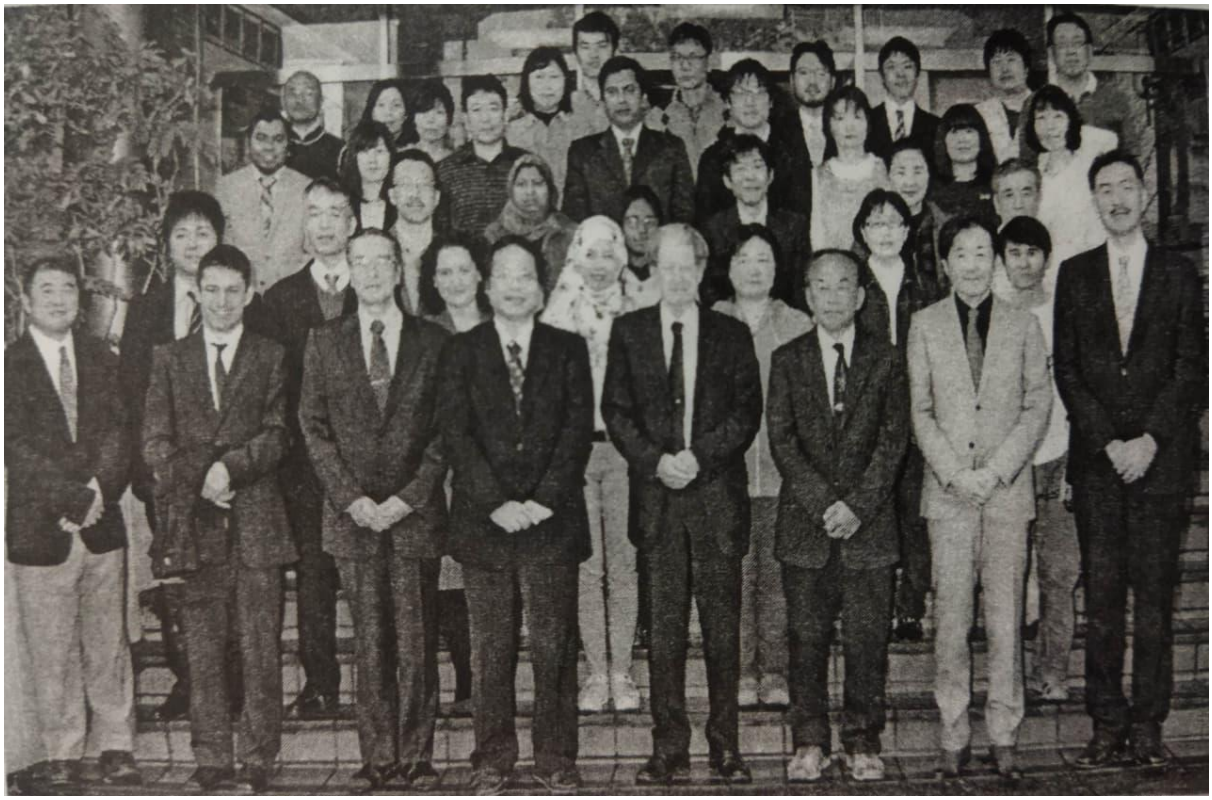

ফিজিওলজিতে ২০১২ সালে নোবেল বিজয়ী স্যার জন গর্ডনের সঙ্গে অন্যান্য অতিথি ও লেখক

টোকিও ভিজিট

একবার টোকিওর খুব কাছাকাছি কিউও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কনফারেন্স ছিল। আমি সুমিডা শেনসিসহ ল্যাবের আরও কয়েকজন ওখানে গেলাম। কনফারেন্স শেষে সবাই হিরোশিমার উদ্দেশে রওয়ানা দিল। আমি শেনসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টোকিওতে রয়ে গেলাম। আমার বন্ধু অনুপম সায়তামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। আমি তাকে ফোন দিলাম, বন্ধু এলো। আমি টোকিও শিনানজো রেলস্টেশনে হাজারো মানুষের মধ্যে অপেক্ষা করছি। বন্ধু খুব চালাক। সে ঠিকই এত মানুষের ভিড়ে আমাকে চিনে নিল। শিনানজো টোকিওর সবচেয়ে বড় এবং ব্যস্ত শহর। দৈনিক কয়েক লাখ মানুষ মনে হয় এই স্টেশনের বিভিন্ন গেট দিয়ে পার হয়। হায়রে জাপানি! এত ব্যস্ত তারা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। টোকিওর সাবওয়েও অনেক সুন্দর। পুরো টোকিওর সঙ্গে এই শিনানজো শহরের কানেকশন। বন্ধু আর আমি টোকিওর নানা জায়গা দেখে সায়তামার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ঘণ্টা দেড়েক পর আমরা সায়তামাতে পৌঁছলাম। হিরোশিমা আর সায়তামার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। বাড়ি-ঘর, দোকানপাট সবই এক ও অভিন্ন। সায়তামা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। বন্ধুর বাসায় গেলাম। ভাবি অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার রান্না করে যত্ন করে খাওয়ালেন। বন্ধু হিন্দু হলেও আমাকে যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়াল এবং তার বাসায় রাখল। আমি বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ। পরের দিন সায়তামা থেকে টোকিওতে আসার পথে রুপ্‌পুংগি হয়ে এলাম। অনেক সুন্দর একটা জায়গা। শুনেছি সাধারণত প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে এসে গল্প করে। প্রেম করার জন্য খুবই উৎকৃষ্ট জায়গা। পাশেই বিরাট বিরাট শপিং মল, ডিস্ক, বার ইত্যাদি। আমেরিকানসহ অনেক বিদেশি দূতাবাস এই এলাকায় অবস্থিত। জাপানের আসাহি টিভির হেড অফিস এই রুপ্‌পুংগিতেই অবস্থিত। টোকিও টাওয়ার দেখতে গেলাম। টাওয়ারের উপরে উঠলে পুরো টোকিওকে একটা গোলকের মতো মনে হয়। প্রতিটি বিল্ডিং ও বাড়ি দেখে মনে হয় সবেমাত্র তৈরি করেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জাপান পৃথিবীর সেরা। আরও নাম না-জানা বিভিন্ন স্থান দেখে বুলেট ট্রেনে হিরোশিমার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। হিরোশিমা থেকে সাইজো। নিজের গৃহে এক অন্যরকম অনুভূতি।

জাপানের রাজধানী টোকিও

সেমিনার কিংবা কনফারেন্সের জন্য জাপানের বিভিন্ন প্রিফেকচারে ঘুরে বেড়িয়েছি। ফুকুওকা, ইয়ামাগুচি, নারা, টোকিও, হোক্কাইডো প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছি। খুব ভালো লেগেছে যে, জাপানিরা মোটামুটি সব জায়গার মানুষ একই রকম। অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম আছে ওকিনাওয়ার মানুষ। তারা জাপানের মূল ভূখণ্ডের মানুষের তুলনায় একটু অন্যরকম। তারা অনেকটা ফ্লেক্সিবল। সর্ব উত্তর হোক্কাইডো প্রিফেকচার। অনেক ঠান্ডা হোক্কাইডোতে। কনফারেন্স শেষে সুমিডা শেনসি নিয়ে গেলেন ওনার অনার্স লাইফের সময়টায় যে জায়গায় কাটিয়েছেন, তা দেখার জন্য। শেনসি হোক্কাইডোতে অনার্স শেষ করেছেন। হোক্কাইডো অনেক সুন্দর একটা শহর। রাস্তাগুলো লম্বালম্বিভাবে সাজানো। নম্বর জানা থাকলে বাড়ি কিংবা দোকান খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। টোকিওর তুলনায় জনবসতি অনেক কম। শীতকালে প্রচুর বরফ পড়ে। সাইবেরিয়ার খুব কাছে বলে এখানে শীত একটা বড় সমস্যা। তবে হোক্কাইডোর মানুষ এই তীব্র শীতে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় তা জানে। সাদা তুলার মতো এই তুষার তাদের ঐতিহ্যের একটি

অংশ। সুমিডা শেনসির সঙ্গে হোক্কাইডো শহর থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি উপশহরে গিয়েছিলাম। অনেক প্রাচীন ছোট এই উপশহরটি। লেকের মতোই ছোট একটি নদীর পাশে পুরোনো বাড়ি-ঘর। অনেক কবুতর ও নাম না-জানা অনেক পাখির কোলাহল ছিল। পাখিগুলো হাতের খুব কাছাকাছি চলে আসত। মনে হয়, পাখি আর মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। পাড় দিয়ে কিছুদূর হাঁটতেই চোখে পড়ল মানিক মিয়া এভিনিউর ফুটপাতে বসে ছবি আঁকার মতো একজন জাপানি, যিনি ২০০০ ইয়েনের বিনিময়ে হুবহু মানুষের মুখের নকল ছবি আঁকেন। আবেগের তাড়নায় ২০০০ ইয়েন দিয়ে নিজের একটা ছবি আঁকিয়েছিলাম। এখন ছবিটি কোথায় আছে জানি না। মাঝে মাঝে যখন একা থাকি, তখন অতীতের অনেক স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই। জীবনটাই মনে হয় স্মৃতিময়।

সুমিডা শেনসির সঙ্গে হোক্কাইডো পুরোনো উপশহরে লেখক

জার্মানি টুর

একদিন অনলাইনে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম বায়োডাইভার্সিটি এবং সিস্টেমেটিকের ওপর জার্মানির বার্লিনের ফ্রি-এ ইউনিভার্সিটিতে কনফারেন্স। দৌড়ে গিয়ে সুমিডা শেনসিকে বললাম। শেনসি কিছুক্ষণ চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল। আমি আমার রুমে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি অ্যাবস্ট্রাক্ট রেডি করে কনফারেন্সের জন্য জমা দিয়ে দিলাম। কয়েকদিন পর রিপ্লাই পেলাম আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট একসেপ্টেড। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির ২১-২৭ তারিখের মধ্যে কনফারেন্স ছিল। তো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ফ্লাইটের ডেট ঠিক হলো। সুমিডা শেনসি এয়ারলাইনস কোম্পানিকে ডেকে আমাদের দুজনের রাউন্ড টিকিট কেটে নিলেন। শেনসি বললেন, সকাল ৮টার মধ্যে হিরোশিমা এয়ারপোর্টে থাকতে। আমি ব্যাগ গুছিয়ে সকালে উঠে ট্রেন ও বাস ধরে হিরোশিমা এয়ারপোর্ট পৌঁছলাম। নিজের মধ্যে মনে হলো যেন এক স্ফুলিঙ্গ খেলা করছে। স্নায়ুটা উত্তেজিত হয়ে গেল। জীবনের প্রথম জাপান টু জার্মানি ভ্রমণ। সঙ্গে বন্ধুসুলভ জাপানি শিক্ষক। আবেগ আর উত্তেজনায় ভরপুর মন নিয়ে এনা বিমানে উঠলাম। হিরোশিমা টু টোকিও। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে টোকিওতে পৌছলাম। সম্ভবত নারিতা এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে সবকিছু চেকআপ করে শেনসির সঙ্গে কেএলএম দোতলা বিমানে চড়লাম। টোকিও টু নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম। পুরুষ বিমানবালাটি খুবই স্মার্ট। চোখে চশমা, বুকে একটি লালচে চিকন টাই, টাইট প্যান্ট আর খয়েরি রঙের ফুল হাতা শার্ট। লোকটি সুমিডা শেনসিকে দেখলাম ভালো মানের বিয়ার দিচ্ছে আর আমাকে সফট ড্রিংকস। সঙ্গে সাদা ক্রিম দিয়ে পাউরুটি। খুব মজা করে খাচ্ছিলাম। এত লং জার্নি ছিল যে, বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছিল। সামনের টিভির স্ক্রিনে নানা ধরনের নাচ, গান দেখলাম। সীমিত ছবি কিন্তু খুবই স্ট্যান্ডার্ড। এগুলো দেখতে দেখতে একসময় আমরা আমস্টারডাম এসে পৌঁছলাম। আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে ঢুকতেই বিশাল বড় বড় ডাচ মেয়ের ছবি চোখে পড়ল। এরা উচ্চতায় অনেক লম্বা। পায়ে লম্বা হিল, ঠোঁটে ব্রাউন লিপস্টিক, গায়ে পাতলা ব্লেজার, এক ধরনের ধূসর চাহনি। সব মিলিয়ে ডাচ মেয়েদের অপূর্ব লাগছিল। মনে হচ্ছিল বারো ঘণ্টার ক্লান্তি এখানেই শেষ। লম্বা লাইনে দাঁড়ালাম। আমার আগে সুমিডা শেনসি পরে আমি। আমাদের একটু তাড়াহুড়া ছিল নেক্সট কানেক্টিং ফ্লাইট ধরার জন্য।

আমস্টারডাম টু বার্লিনের টিগেল এয়ারপোর্ট। ইমিগ্রেশন অফিসার সুমিডা শেনসির পাসপোর্ট ও এয়ার টিকিট চেক করে ছেড়ে দিলেন। এবার আমি গেলাম।

আমার পাসপোর্ট বারবার চেক করেছে এবং রাউন্ড ট্রিপ এয়ার টিকিট চেক করল। আমি বার্লিনে কেন যাচ্ছি, কবে ফিরে আসব ইত্যাদি প্রশ্ন। ইমিগ্রেশন গ্লাসের ওপারে শেনসি। আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত। অবশেষে প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পর ছেড়ে দিল। দৌড়ে নেক্সট বিমানে উঠলাম বার্লিনের উদ্দেশে। বিমানটি মোটামুটি ছোট। যাত্রীও কম। আমার পাশেই এক কাপল বসেছিল। মেয়েটি জাপানি আর ছেলেটি জার্মানি। সম্ভবত সদ্য বিবাহিত। ছোট একটি বাবুও আছে। কথাবার্তায় যা বুঝলাম, জাপানি মেয়েটি বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। তার মনের ভেতর নানা রকমের এলোমেলো চিন্তা কাজ করছে। ছেলেটি কেএলএম বিমানে যথেষ্ট মার্জিত ও ভদ্র মনে হয়েছিল। কিন্তু এই বিমানে ওঠার পর সে একটা পা সিটের ওপর রাখল- যেন শাহেনশাহ। বিমানবালা এসে অনুনয় করে তাকে তার সিটে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। ছেলেটি মোটেও কথা রাখেনি। সে এলোমেলো হাঁটছে। সম্ভবত নিজের বাড়িতে যাচ্ছে। তাই সবকিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেল। বিমানটি টিগেল এয়ারপোর্টে আনুমানিক দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল। এখানে আবার ইমিগ্রেশনে লাইন। শেনসি আগে, পেছনে আমি। শেনসিকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করেনি। এবার আমার পালা। আমার পাসপোর্ট, রাউন্ড ট্রিপ ইত্যাদি চেক করে ছেড়ে দিল। ইমিগ্রেশন থেকে বের হয়ে বেল্ট থেকে লাগেজ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় টাক মাথাওয়ালা একজন লোক আমাকে ডেকে আলাদা করে রাখল। নিয়ে গেল ছোট একটা রুমে। আমি তো হতবাক। শেনসিও বুঝতে পারছে না, কী থেকে কী হচ্ছে! লোকটি আমাকে নাম ধরে ডাকছে। এতে আমি আরও ঘাবড়ে গিয়েছি। আশ্চর্য, লোকটি আমার নাম জানল কী করে! সেই প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে বেড়াই। কেন আমি জার্মানি যাচ্ছি, কবে ফিরব ইত্যাদি প্রশ্ন করে অবশেষে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি লজ্জিত শেনসির কাছে। কারণ, বারবার শুধু আমারই প্রবলেম হচ্ছে। শেনসির কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আমি লজ্জিত, অপমানিত, মর্মাহত ও স্তব্ধ। তখন বুঝলাম জাপানি আর বাংলাদেশি পাসপোর্টের মধ্যে কত পার্থক্য।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে একটি লম্বা নিমোজিন টাইপের বাস ধরলাম বার্লিনের উদ্দেশে। বাসটিতে বসার তেমন কোনো সিট নেই। তবে দাঁড়িয়ে ধরার জন্য মাথার ওপরে অনেক প্লাস্টিকের হাতল লাগানো আছে। আমি আর সুমিডা শেনসি অনেক টায়ার্ড। শেনসি আর আমি পাশাপাশি দাঁড়ালাম। বাসটিতে গুলিস্তান টু ফার্মগেট যাওয়ার মতো লোকে লোকারণ্য। আমাদের পাশেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাসটি কয়েক মিনিট যেতে-না-যেতেই ছেলে মেয়েটিকে জোরে

জোরে কিস শুরু করে দিল। আমরা এশিয়ান মানুষ, কিছুটা লজ্জাবোধই করলাম। শেনসি আমার দিকে তাকিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেললেন। আমি চোখ নিচে নামালাম। আবার একটু আড় চোখে তাকাতেই দেখি তাদের প্রণয় শেষ হয়নি। পরে ভাবলাম এটা ইউরোপ। ইউরোপিয়ানদের কালচার এমনই। আমরা বার্লিন শহরে নামলাম। হোটেল খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। শেনসিরও এটা জীবনে প্রথম জার্মানি সফর। অনেক জাপানিকে ওখানে দেখলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক জাপানি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। জাপান এবং জার্মানির মধ্যে অনেক ভালো সম্পর্ক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হোটেল পেলাম। হোটেলটা আগেই অর্গানাইজারদের দেওয়া লিংক থেকে খুঁজে বুকিং দিয়েছিলাম। এত ঠান্ডা জার্মানি! কোনোরকম লাগেজ হোটেলে রেখে খেতে চলে গেলাম পাশের দোকানে। হালাল খাবার বলতে তেমন কিছু নেই। আমি ক্ষুধায় অস্থির। শেনসি পেট ভরে খেল আর আমি কিছু স্প্যাগোটি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম।

হোটেলটি খুব সুন্দর। একদম প্রাকৃতিক পরিবেশে মোটামুটি দোতলা টাইপের। জার্মানির এত শীতের মাঝে তাদের রুম হিটিং সিস্টেম কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। নতুন এই সিস্টেমের সঙ্গে আমি কিংবা সুমিডা শেনসি কেউই পরিচিত নই। দুজন একই রুমে কিন্তু আলাদা বিছানা। অনেক সংশয় আর ভয়ের মধ্যে রাতটি পার হলো। পরদিন সকালে উঠে দেখি এক ভদ্রমহিলা, বয়স আনুমানিক ৬০ হবে, আমাদের জন্য নাশতা তৈরি করেছেন। মহিলাটি এই হোটেলের মালিক এবং সে নিজেই রান্নাবান্না করে ক্লায়েন্টদের খাওয়ায়। মহিলাটি বেশ আন্তরিক। পরনে ঢোলা প্যান্ট, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, গলায় মোটা মোটা সাদা গোটার চেইন, কানে দুটি ছোট ছোট স্কয়ার-জাতীয় অলংকার, চুল বব কাট। দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট এবং মার্জিত। বোঝা যায় যৌবনে কত আবেদনময়ী ছিলেন এই মহিলা।খাবারঘরে ঢুকে দেখি একটি থালায় কালো রঙের ব্রেড, কর্ন ফ্লাওয়ার, পাশে দুধের গ্লাস আর সিদ্ধ কাটা ডিম। জেলি দিয়ে কয়েক টুকরো ব্রেড আর এক গ্লাস দুধ খেলাম। সামনে সুন্দর মাঠ। যেন আমাদের বাড়ির পাশের জঙ্গলের মাঝখানের জায়গা। নানারকম উদ্ভিদ সেখানে। পশু-পাখিও রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, মহিলাটি এখানে অনেক সাপ ও রেপটাইল-জাতীয় প্রাণী পোষে। আমার গা তো ছমছম।

হোটেল থেকে হেঁটে হেঁটে কাছের একটি সাবওয়ে স্টেশন ধরে আরেকটি কানেকটিং রুটে ফ্রি-এ ইউনিভার্সিটিতে যেতে হতো। কনফারেন্সে অনেক খাবার বুফে স্টাইলে সাজানো ছিল। কিন্তু হালাল খাবারের স্বল্পতা ছিল বিধায় পেট ভরে কোনোদিনই খেতে পারতাম না। পোস্টডাম স্টেশনের কাছে একজন তুর্কি নান

রুটি, পোড়ানো মাংস আর সবজি-সালাদ বিক্রি করত। এটা পুরোটাই হালাল। কনফারেন্সে আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই ওখানে পেট ভরে খেতাম। যতদিন বার্লিনে ছিলাম ততদিন আসা-যাওয়ার পথে ওই দোকানে যেতাম অন্তত একবেলা পেট ভরে খেতে। একদিন আমি আর সুমিডা শেনসি বেঞ্চে বসে আছি। স্বাভাবিকভাবেই আমি আর সুমিডা শেনসি ইংরেজিতে কথা বলছি। একজন বয়স্ক জার্মানি এসে আমাদের ধমক দিলেন এবং বললেন কেন আমরা ইংরেজিতে কথা বলছি? শেনসি আর আমি হতবাক ও বিহ্বল। লোকটি এমন করে কেন? আমরা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে খেলাম। যাইহোক, এটা আমাদের দেশ না, জার্মানি। ওই দোকানের পাশেই একটি বিরাট শপিং মল। আসলে এটা অনেক ব্যস্ত চৌরাস্তার মোড়। অনেক মানুষের মিলনস্থল এই জায়গাটি। এর পাশেই লম্বা একটি বিল্ডিংয়ে সুন্দর করে ঘড়ি বসানো। এই ঘড়িটিই মনে হচ্ছিল এই মোড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পাশের একটি শপিং মলে ঢুকলাম। এত সুন্দর সুন্দর কাপড়চোপড়! দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে মেয়েদের কাপড় এখানে অনেক বেশি। সেলসম্যান মেয়েটি অদ্ভুত সুন্দর। হলিউডের নায়িকার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। টাইট জিন্স, সাদা ফ্রক, দুই হাতের মাঝ বরাবর কাটা। সোনালি রঙের চুল, গাঢ় কাজলের ভ্রু। একদম ১৬/১৭বছর বয়সের মেয়েটি মনে হচ্ছিল যেন কোনো এক পরি। পুরো শপিং মলটি শুধু ঘুরেই দেখলাম। কয়েক জোড়া হাতমোজা ও একটি ক্যাপ কিনেছিলাম।

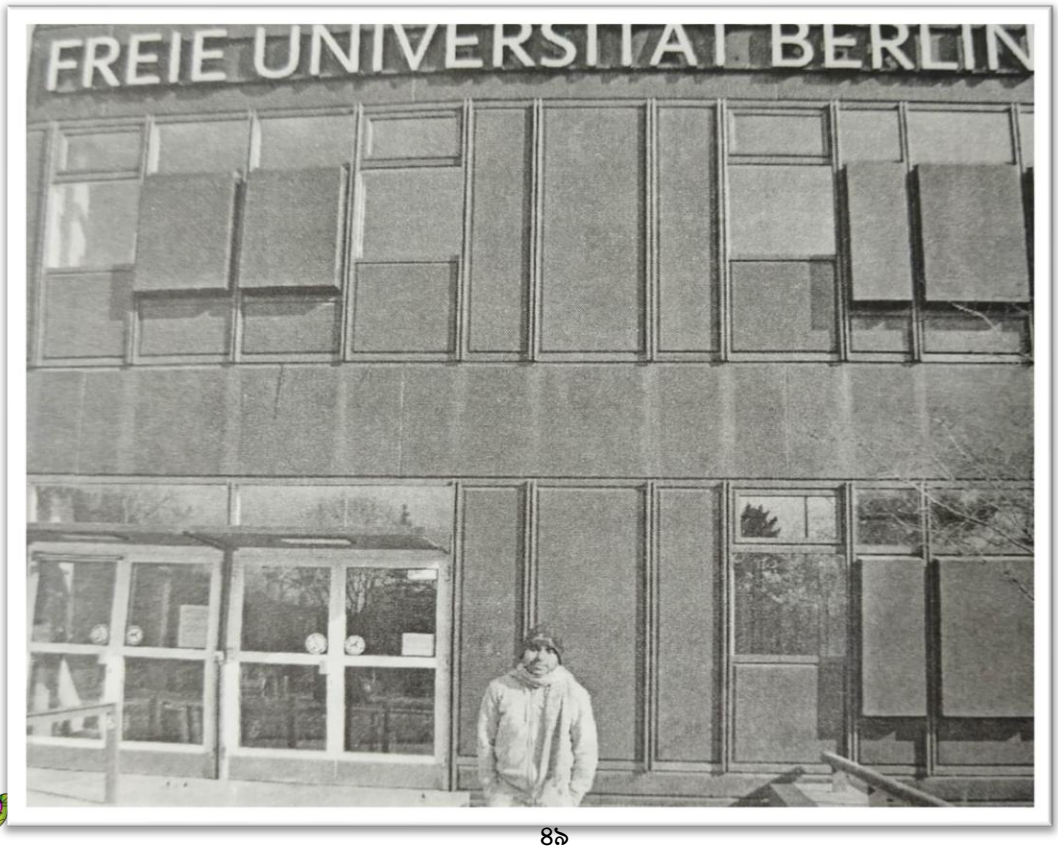

জার্মানির বার্লিনের ফ্রি-এ ইউনিভার্সিটির সামনে লেখক

এভাবেই দেখতে দেখতে কনফারেন্সের শেষদিন চলে এলো। ওইদিন বড় বড় সায়েনটিস্ট এবং প্রফেসরের সঙ্গে একটু সুযোগ খুঁজে কথা বলার চেষ্টা করতাম। সবশেষ আয়োজন ছিল সন্ধ্যার দিকে বার্লিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্ডেন। ওখানে আমি, সুমিডা শেনসি আর পাকিস্তানি ২/৩ জন সায়েনটিস্ট একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে মদ ও নানারকম খাবার সাজানো। কনফারেন্স সভাপতি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন এবং আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া শুরু করলাম। চামচ দিয়ে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। খাওয়ার শেষের দিকে সুমিডা শেনসি আর আমি একটু হেঁটে গার্ডেনের এক কোণে করুণ সুরের পিয়ানো শুনছিলাম। শেনসি পাথরের সিঁড়িতে বসে খুবই মনোযোগ দিয়ে গান শুনছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সুমিডা শেনসির স্ত্রী বেশ কয়েক বছর আগে ক্যানসারে মারা যান। ওইদিন সাময়িক সময়ের জন্য হলেও আমি সুমিডা শেনসির মুখে করুণ প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সম্ভবত শেনসি অতীতের কোনো স্মৃতি হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন। তারপর আমরা গ্রিনহাউসে নানারকম উদ্ভিদ দেখলাম। এই গার্ডেনে প্রায় ২২,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলো প্রকৃতিতে এন্ডেঞ্জার্ড অথবা ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখন এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। এই গার্ডেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তারপর আমরা দেখলাম বার্লিন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম। জার্মানিরা একে 'মিউজিয়াম ফর ন্যাচারকুনডে' বলে। মিউজিয়ামটি ১৮১০ সালে বর্তমানের 'হামবোল্ট ইউনিভার্সিটির' অংশ হিসেবে প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভকরেছিল। ইউ-বান স্টেশন খুব কাছেই। এই মিউজিয়ামটিতে ১০,০০০ টাইপের বেশি স্পেসিম্যান আছে। আমার জন্য তো বটেই, বিশ্বের বেশিরভাগ ট্যাক্সানোমিস্টের জন্য এটা একটা তীর্থস্থান। বায়োডাইভার্সিটি এবং ইভলুশন বিষয়ে লেখাপড়া করতে গেলে এই মিউজিয়ামে একবার ঢু মারা উচিত। কত বিচিত্র জিনিসপত্র, যত দেখি তত মুগ্ধ হই। ভাবি মানুষ কি না পারে? বিশাল কালেকশন। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি ডাইনোসরের কঙ্কাল দেখে। ডাইনোসরটির সায়েন্টিফিক নাম *Giraffatitan Brancai* । বিশাল আকৃতির দেহ। পৃথিবীর বড় মাউন্টেড স্কেলিটন। উচ্চতা ১৩.২৭ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ২২.৫ মিটার। পান্ডাসহ নানা প্রাণীর কালেকশন দেখছিলাম। যেহেতু আমি অ্যাম্ফিবিয়ান নিয়ে লেখাপড়া করেছি সেহেতু আমি নানারকমের অ্যাম্ফিবিয়ানের কালেকশন দেখছিলাম।

ফ্রি-এ ইউনিভার্সিটির কনফারেন্সে অন্যান্য অতিথির সঙ্গে লেখক

তারপর আমরা হামবোল্ট ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। আজ থেকে দুই শতাধিক বছর আগে (অক্টোবর ১৫, ১৮১০ সালে) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে একে 'ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন' বললেও ১৯৪৯ সাল থেকে একে 'হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি' বলা হয়। আমি যেখানে পেপার প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম সেটি পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থিত এবং এই হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি পূর্ব জার্মানিতে অবস্থিত। হামবোল্ট ইউনিভার্সিটির সামনে উইলহেলম বন হামবোল্ট-এর একটি স্ট্যাচু রয়েছে। তিনি একজন ফিলোসফার এবং লিঙ্গুয়িস্ট ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই আলেকজান্ডার বন হামবোল্ট। তিনি ছিলেন মূলত একজন জিওগ্রাফার। ন্যাচার সায়েন্সে ওনার অনেক অবদান আছে। এই দুই ভাইয়ের নামানুসারে 'বার্লিন ইউনিভার্সিটি'-কে 'হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি' বলা হয়। এই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন আর ইতিহাস জড়িত। এদের অনেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। জার্মানির ন্যাচারাল সায়েন্সের বিষয়ে গবেষণায় এই ইউনিভার্সিটির অবদান অনেক বেশি। আলবার্ট আইনস্টাইনের পায়ের ছোঁয়াও এই ইউনিভার্সিটিতে আছে। এগুলো মনে করে আমি অনেকটা বিচলিত হয়েছিলাম। বারবার চারদিকে দেখছিলাম-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট, পাথর আর সুউচ্চ অট্টালিকা। আমার কাছে মনে হয়েছে যেন পৃথিবীর সব জ্ঞানের এক তীর্থস্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়।

তারপর আমরা চলে গেলাম ব্রেনডেনবার্গ গেট দেখতে। পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানির মধ্যে এই গেট এক বিরাট সেতুবন্ধের কাজ করছে। কেউ কেউ এই গেটটিকে 'শান্তির গেট' বলে ডেকে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির স্নায়ুযুদ্ধের সময় ১৯৬১ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত গেট বন্ধ ছিল। অফিশিয়ালি ১৯৯০ সালের দিকে গেটটি খুলে দিলে দু'পারের হাজার হাজার মানুষ খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির মধ্যে নানারকম দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সৃষ্টি হয়। সেজন্য ব্রেনডেনবার্গ গেট আজও দুই জার্মানির মিলনস্থলের সাক্ষী হয়ে আছে।

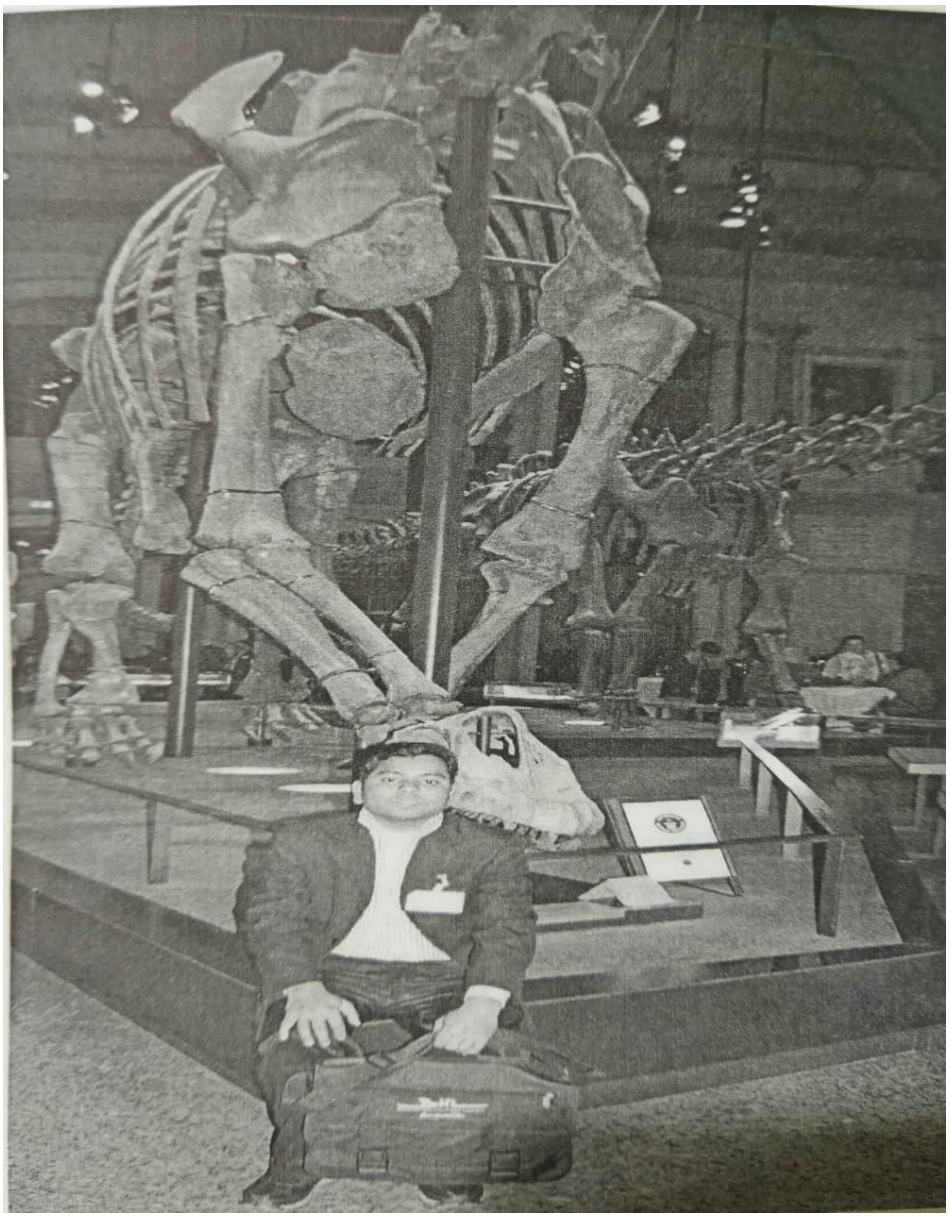

জার্মানির বার্লিন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে মাউন্টেড ডাইনোসরের সামনে লখক

বার্লিন ওয়াল ১৩ আগস্ট ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানির লোকজন তৈরি করে। বার্লিনের সঙ্গে এই ওয়ালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৫ কি.মি. এবং উচ্চতা ১২ ফুটের কাছাকাছি। ওয়ালটির বেশিরভাগ অংশই পূর্ব জার্মানির জায়গার মধ্যে ছিল। ওয়ালটি নির্মাণ করার সময় 'ন্যাশনাল পিপলস পার্টির' এবং কমব্যাট গ্রুপ অব ওয়ার্কিং ক্লাস সৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকত। যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো। এতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি বিভক্ত হয়ে গেল। যেসব পূর্ব জার্মানির অধিবাসী পশ্চিম জার্মানিতে চাকরি করত, তারাও চাকরি হারাল। অনেকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আর দেখা করতে পারত না। এক ধরনের চাপা ক্ষোভবিরাজ করছিল। পশ্চিম জার্মানিরা শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ করেছিল। বিশেষ করে বার্লিনের মেয়র উইলি ব্রান্ডটের নেতৃত্বে অনেক মিছিল ও সভা-সমাবেশ করেও বার্লিন ওয়াল তৈরি বন্ধ করা যায়নি। পূর্ব জার্মানিদের অনেক অভিযোগ ছিল যে, পশ্চিম জার্মানিরা পূর্ব জার্মানিতে গিয়ে সব ধরনের জিনিসপত্র কিনে ফেলে এবং তারা সেখানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। এমনকি, ব্রেনডেনবার্গ গেট দিয়ে শুধু পশ্চিম জার্মানিদের পূর্ব জার্মানিতে ঢুকতে দেওয়া হয়। অথচ পূর্ব জার্মানিদের এই গেট দিয়ে খুব একটা যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না। মূলত, দু'পক্ষের রাজনীতি বিচ্ছেদের মধ্যে এসব বিষয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। যেমনটা আমাদের মধ্যে করা হতো পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব জার্মানির আশেপাশের দেশগুলোতে পতনের পর এই ওয়াল ভাঙার বিষয়ে ধীরে ধীরে সমঝোতা আসে। যার ফলে ১৯৮৯ সালে এই 'বার্লিন ওয়াল' ভেঙে ফেলতে দু'পক্ষই সমঝোতায় আসে। ২০১১ সালে আমি যখন বার্লিন ওয়াল দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে তখনো কিছু কিছু জায়গায় ওয়াল বিদ্যমান ছিল। ওইসব ওয়ালে নানারকম তৈল চিত্রকর্ম আঁকা আছে। আমি উপহার হিসেবে একমুঠো মাটি কিনে এনেছিলাম এবং হিরোশিমা ইউনিভার্সিটিতে আমার অনুজ মি. কোমাকি সানকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম। জার্মানিরা এই বার্লিন ওয়ালের মাটি 'সুভনিয়র' হিসেবে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে। এই ওয়ালের পাশ দিয়ে যখন হাঁটতাম, তখন আমার মনে হতো কত বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রেমিক-প্রেমিকা আরও নাম না-জানা অগণিত মানুষ এই ওয়ালকে টপকাতে গিয়ে মারা গিয়েছে। এই ওয়াল ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি ওয়ালের নানা চিত্রকর্ম ভালোভাবে মেনে নিতে পারিনি। এই ওয়ালকে ঘৃণা করলেও দুই পারের মানুষের প্রতি রইল আমার অগাধ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা।

জার্মানির বার্লিনের ব্রেনডেনবার্গ গেটের সামনে লেখক

ওয়ালটির ওই পাড়ে যখন গেলাম দেখি একটি বিশাল নদী। নদীতে বরফের বড় বড় স্তূপ বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখলাম একটি কুকুর নিয়ে ওই নদীর পাড় ঘেঁষে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুপারের মানুষের আত্মত্যাগের কথা ভেবে, এই নদীর বহমান জলের সঙ্গে আমার চোখের অশ্রু একাকার হয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি নদীর পাড়ে

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির বার্লিন ওয়ালের পাশে লেখক

বসেছিলাম। কল্পনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাড়ির পাশের পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের কথা ভেবে। ব্রহ্মপুত্রের পাশেই ছিল আমার স্কুল। অনেক বন্ধুও-মিজান, শাহিন, তুহিন যারা ওই পাড় সনমানিয়া থেকে এপাড়ে স্কুলে আসত, আমার কল্পনায় তাদের মুখাবয়ব স্প্রি নদীর সাদা ও শুভ্র বরফের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে গিয়েছিল। এই তীব্র শীতেও আমার মনে হয়েছিল আমি ঝাঁপ দিই এই নদীতে। ঘ্রাণ নেই নদীর পানির আর খেয়ে যাই নদীর ওপর বেয়ে চলা এই শুভ্র বরফ। কত মানুষ বার্লিন ওয়াল পার হতে গিয়ে এই নদীতে পড়ে মরে গেছে তার কোনো চিহ্ন বা সাক্ষী কোথাও নেই। আমি ভালোবাসতে চেয়েছিলাম নদীকে, তার এই বহমান স্রোতধারাকে। কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে থাকা এই স্প্রি নদীকে খুব একটা আপন করে নিতে পারিনি। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসে যখন গুনগুন গান গাইতাম কিংবা পহেলা বৈশাখে নানারকম ঘুড়ি ওড়াতাম-সেই আবেগ আর আমেজ আমার মধ্যে কাজ করেনি সেখানে। জার্মানির হাভেল নদীর উপশাখা এই স্প্রি নদীতে রয়ে গেল বুকভরা আর্তনাদ আর হাহাকার।

ক্যাথডিয়াল আর্ট মিউজিয়ামসহ আরও অনেক মিউজিয়াম দেখেছি। জার্মানির মিউজিয়ামগুলো দেখে আমি হতবাক ও আশ্চর্য হয়েছি। প্রতিটি মিউজিয়ামের

দালান, কারুকার্য ও সিঁড়ি এত মজবুত পাথর দিয়ে তৈরি এবং এত সুউচ্চ ভাবতেই অবাক লাগে। একটি মিউজিয়ামের সিঁড়ি দেখেছি যা বাংলাদেশের মোটামুটি দোতলা বিল্ডিংয়ের সমান। তাদের এত নিপুণ কারুকার্য ও এত সুন্দর আর্কিটেকচারাল ভিউ যা দেখে পৃথিবীর যে কেউ খুশি না হয়ে পারবে না। এগুলো আমরা হাঁটতে হাঁটতেই দেখছিলাম। হঠাৎ আমরা জার্মানির চ্যান্সেলর মার্কেল এঞ্জেলা যেই ভবনে থাকেন তার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার অনুভূতি ছিল তুঙ্গে। পৃথিবীর এত নামকরা একজন পলিটিশিয়ানের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি। মার্কেল পূর্ব জার্মানিতে বড় হলেও তিনি পুরো জার্মানিকে শক্ত হাতে গড়ে তুলেছেন। অর্থনীতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে মার্কেলের অবদান অনস্বীকার্য। পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির ওপর তিনি পিএইচডি করেছিলেন। তিনি শুধু জার্মানির বড়মাপের নেত্রী নন, পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। তার বর জোবিম সোআর হামবোল্ট ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির প্রফেসর।

এভাবে দেখতে দেখতে চলে গেলাম ছোটবেলায় শোনা বহু মানুষের নায়ক এডলফ হিটলারের সমাধি দেখতে। নাৎসি বাহিনী যার হাতে গড়া, সেই এডলফ হিটলারকে বাস্তবে না দেখতে পারলেও তাঁর সমাধি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। সুমিডা শেনসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালাম ওখানে নিয়ে যেতে। শেনসি রাজি হলেন। খুব কৌতূহল হলো তার সমাধি দেখতে। যেই বাঙ্কারে হিটলার আত্মহত্যা করেছিল নিজের গানশট দিয়ে, সেই হিটলারের সমাধি না দেখে বার্লিন থেকে যাব না দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ছিলাম। তার স্ত্রী ইভা ব্রাউন নাকি খুবই সুন্দরী ছিলেন। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর হিটলার মৃত্যুর ৪০ ঘণ্টা আগে তাকে বিয়ে করেছিল। সেও ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল বিকেলে সায়ানাইড ট্যাবলেট খেয়ে স্বামীর সঙ্গে আত্মহত্যা করেছিল।

যখন মিত্রশক্তি বার্লিনের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে এবং পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হিটলারকে ধরে ফেলার পরিকল্পনা করছিল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হিটলার নিজেই নিজের জীবন কেড়ে নেন। বাঙ্কারের যেই রুমে হিটলার মারা গিয়েছিল, সেই রুমেই ৩৩ বছর বয়সি তার প্রিয় প্রেমিকা আত্মহত্যা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে জার্মানির মানুষ হিটলারের সঙ্গে ইভা ব্রাউনের প্রণয় আর ভালোবাসার কথা জানত না। ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তি হিটলার তাকে দীর্ঘ প্রায় ১২-১৩ বছর শয্যাসঙ্গী করেছিল। কিন্তু পরাজয় জেনে আত্মহত্যার ৪০ ঘণ্টা আগে বাঙ্কারে একবারে নিজেদের পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে সেই বিবাহ

উদ্যাপন করা হয়েছিল। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে হিটলার তার প্রিয়তমাকে কী বলে রাজি করিয়েছিলেন যে, তিনি আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয়তমাও আত্মহত্যা করবে। এই নিয়ে তেমন কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও আমার মনে হয়, হিটলার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে হয়তো ভেবেছিলেন তার মৃত্যুর পর তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে। ভালোবাসার এই চরম সমীকরণে ইভা আর হিটলার চিরকাল মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেবে। তবে একটা জিনিস লক্ষ করেছি, জার্মানির লোকজন হিটলারকে নিয়ে তেমন কোনো তথ্য কিংবা আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়।

ইভা ব্রাউন ১৯১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জার্মানির 'ম্যানিক' শহরে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৩২ সালের দিকে তারা নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরকে ভালোবাসে। ইভা ব্রাউন যখন হিটলারকে বিয়ে করেছিল তখন ইভা ব্রাউনের বয়স ছিল ৩৩ বছর এবং হিটলারের ৫৬ বছর। দীর্ঘ এই প্রণয়, ভালোবাসা এবং বিয়ে পুরোটাই নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলার ক্ষমতায় থাকাকালে বহু মানুষকে হত্যা করেছিল। বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লেগেছিল এটা জেনে যে, আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩৩ সালে আমেরিকা থেকে নিজ দেশে ফিরে আসেননি এই হিটলারের ভয়ে। অথচ নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইন জার্মানিরই নাগরিক। সুইজারল্যান্ডে লেখাপড়া করে জার্মানিতে কিছুদিন চাকরিও করেছিলেন। ঊ = সপক্ষ (ই= এমসি স্কয়ার) সূত্রের জন্য আইনস্টাইন বিশ্ববিখ্যাত। তার ১৯২১ সালের নোবেল পাওয়ার পর আমার মনে হয়, সে আরও অনেক কিছু এই জার্মানিকে দিতে পারত। যাইহোক, যেই কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমরা ওই সমাধির পাশে গেলাম। তেমন কোনো ওয়াল কিংবা তার স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ কোনো জাদুঘর নেই। সেখানে ছড়ানো-ছিটানো পাথর আছে আর চারপাশে সিম্পল একটা দাগ আছে। দাগের ভেতর তার সমাধি। পাশে একটি সাইনবোর্ড। এখানে লেখা আছে হিটলার সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্য। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। যেই হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী এত আলোচনা- সমালোচনা অথচ তার মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই। তাকে কেন্দ্র করে কোনো জাদুঘর নেই। এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত হিটলারকে নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করতে রাজি নয়। তার প্রতি এতটা অনীহা-স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

আমার আগেকার চিন্তা এবং বার্লিনে হিটলারের সমাধি দেখার বাস্তবতা আমাকে নতুন করে ভাবায়। মানুষ আসলে কী! কোথায় তার সার্থকতা! পৃথিবীর ইতিহাস বড়ই জটিল। রেড আর্মি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিত্রশক্তি, অক্ষশক্তি আর হিটলারের কথা ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাস্তার সোডিয়াম লাইটগুলো জ্বলে ওঠে। আমি আর শেনসি ধীরে ধীরে নানারকম বাস আর ট্রাম অতিক্রম করে ক্লান্ত দেহ নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। এদিকে আমি বাউনেটে (কৃষিবিদদের একটি গ্রুপ) একটা মেইল করেছিলাম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইফুল জাহিদ স্যার তখন বার্লিনে পোস্টডক করেন। উনি আমাকে ঠিকানা দিলেন। পরের দিন শেনসি আর আমি ট্রেনে চড়ে বার্লিনের এক প্রান্তে তার বাসায় গেলাম। দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকি বলে সেদিন পেট ভরে খেয়েছিলাম। বিশেষ করে ভাবি মুরগির সুপ তৈরি করেছিলেন। শেনসিও কয়েকবার চেয়ে খেয়েছিলেন। আসলে শেনসি বাঙালি খাবার খেতে খুব ভালোবাসতেন। সেখানেও স্যার আমাদের একটি জাদুঘর দেখিয়েছিলেন। আমরা এই তীব্র শীতে গল্প-গুজব করে স্যারের বাসা থেকে বার্লিনে ফিরেছিলাম। ফেরার সময় আমি দেখেছি রেল স্টেশনের অনেক জায়গায় সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। সত্যি বলতে কি, জার্মানিদের চেয়ে জাপানিরা অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শেষ রাতে সবকিছু গুছিয়ে আমরা লিমুজিন বাস ধরে আবার সেই টিগেল এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন প্রসিডিউর পার হয়ে বিমানে গিয়ে বসলাম। আনুমানিক ২ ঘণ্টা পর আমরা আবার আমস্টারডামে পৌঁছলাম। দেখি অনেক জাপানি ছাত্র-ছাত্রী। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়া শেষবর্ষের এই সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে অনেক গল্প-গুজব করলাম। জাপানি স্টুডেন্টদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা অনার্স প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত আলাবাইতু (পার্ট টাইম চাকরি) করে টাকা-পয়সা জমায় এবং অনার্সের শেষ বর্ষে জাপানের বাইরে যায়। এটি তাদের অনেকের কাছেই একটি রুটিন ওয়ার্ক। আমরা বাংলাদেশে যেমন অনার্স শেষবর্ষে এক্সকারশন টুরে যাই, তেমনি তারাও এক্সকারশন টুরে বিদেশে যায়। এভাবে আমস্টারডাম থেকে কেএলএম ফ্লাইটে টোকিওর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। টোকিওতে পৌঁছে আমাদের নেক্সট কানেক্টিং ফ্লাইটে হিরোশিমা এলাম। এরই মাঝে সুমিডা শেনসিকে দেখলাম টোকিও এয়ারপোর্টে ১০০০ ইয়েন দিয়ে সুন্দর একটা গোসল সেরে নিল। আমরা এনা লোকাল প্লেন ধরে হিরোশিমা পৌঁছলাম। শেনসি চলে গেল হিরোশিমা শহরে তার নিজের বাসায়। আর আমি চলে এলাম সাইজোর সান স্কয়ার ৬১০ নম্বর রুমে। যেই রুম আমার কাছে স্বপ্নের

মতো ছিল। জার্মানির অনেক ইতিহাস আর ঐতিহ্য আমাকে বেশ কয়েকদিন নাড়া দিয়েছিল। বিশেষ করে কনফারেন্সে অস্ট্রিয়ার দুটো মেয়ের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। আমরা মাঝে মাঝে স্কাইপিতেও কথা বলতাম।

জীবন এমনই। জীবন চলে যায় জীবনের মতো। নানা ঘটনার মাঝেও আরও নতুন কিছু করতে মন চায়। মন চায় খোলা আকাশে ঘুরে বেড়াতে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যেতে। হাজার বছর ধরে হাঁটতে ইচ্ছে করে মহাদেশ থেকে মহাদেশে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার জলের মতো ভাসতে ইচ্ছে করে মিশরের নীলনদ, আমেরিকার মিসিসিপি কিংবা চীন, থাইল্যান্ডে, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার তীর ঘেঁষে বয়ে চলা মেকং নদীতে। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতের মতোই একটি বিকেল কাটাতে ইচ্ছে করে কানাডার হাডসন বে-তে। শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, উন্নত দেশগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পৃথিবীর এই সব বৈচিত্র্য সত্যিই অনেক সুন্দর। নিজেকে পরিপূর্ণ করার জন্য এসব ট্রাভেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও কানাডা টুর

তখন সবেমাত্র পিএইচডি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি। ঐড়ঢ়ষড়নধঃৎধপযঁং ষরঃড়ৎধষরং নতুন প্রজাতিটি আবিষ্কার করেছি। অনেকগুলো সায়েন্টিফিক আর্টিকেলের মধ্যে এই নতুন প্রজাতির অর্টিকেলটি বিশেষ গুরুত্ব পেল। সামনেই সপ্তম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব হার্পেটোলজি। কানাডার ভ্যানকুভারের 'ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া' অনুষ্ঠিত হবে। ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০১২ ইং ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। আমিসহ ল্যাবের অনেকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিলাম। ২০১২ সালের আগস্টের ৮-১৪ তারিখ এই কংগ্রেস হয়েছিল। আমরা সবাই হিরোশিমা এয়ারপোর্টে জমায়েত হলাম।

সেখান থেকে এনা বিমানে করে টোকিও। সেখান থেকে বড় দোতলা বিমানে করে ভ্যানকুভার, কানাডা। এয়ার কানাডা এয়ারলাইন্সে টোকিওর নারিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে উঠে কানাডার ভ্যানকুভারে প্রায় ১০ ঘণ্টা জার্নি ছিল। এত দীর্ঘ জার্নিতে আমরা সবাই প্রায় ক্লান্ত ছিলাম। জার্নির মাঝামাঝি এক জায়গায় আমরা দেখেছি এক পাশে দিন আরেক পাশে রাত। এই ক্লাইম্যাক্স দেখে আল্লাহর অপার সৃষ্টির প্রতি আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। তখন ছিল রোজার মাস। আমি রোজা রেখেছিলাম। নামাজ পড়ার জন্য প্লেনের শেষ প্রান্তে (লেজের দিকে) যখন জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়তাম তখন মনে হতো এই বুঝি বিমান

প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে যাবে। কারণ, বিমানটিতে প্রচুর ঝাঁকুনি হতো। আমরা ভ্যানকুভার
এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন কাজ শেষ করে ভাড়া বাসে করে 'ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়' পৌঁছলাম। আমাদের বহনকারী প্রাইভেট কারের ড্রাইভার ছিলেন একজন ভারতীয় শিখ। গায়ের রং হালকা বাদামি, মুখভর্তি কালো লম্বা লম্বা দাড়ি ও গোঁফ আর মাথায় শিখদের টুপি। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে একজন আপাদমস্তক ভারতীয়। আমরা সবাই যার যার রুমে চলে গেলাম। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরেই এই ডরমিটোরি। সাত কিংবা আট তলায় থাকতাম। ডরমিটোরিতে নিজস্ব কোনো ক্যান্টিন ছিল না বিধায় খাওয়া-দাওয়ায় যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হতো। আবার এটা ছিল রোজার মাস। আমি নিয়মিত রোজা রাখতাম। দিন ছিল বাংলাদেশ কিংবা জাপানের তুলনায় অনেক বড়। বেশ কষ্ট হতো; কিন্তু তারপরও রোজা রেখেছি। প্রথমদিকে কয়েকদিন কংগ্রেসে আসা-যাওয়ার পথে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে স্প্যাগোটি আর টমেটো সস দিয়ে তৈরি কিছু খাবার খেয়েছি। তবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তারপর একদিন ক্যাম্পাসের বাইরে গেলাম এক চায়নিজ দোকানে। ওখান থেকে চাল, ডাল, লবণ, তেল, মরিচ ইত্যাদি কিনে ডরমিটোরিতে ফিরে এলাম। ডরমিটোরিতে রুমের ভেতর রান্না করার অনেক সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ভালোভাবে পাক করে পেট ভরে খেলাম। বিপত্তি ঘটল একদিন। ইলেকট্রিক ফ্রাইপ্যানে কী যেন ভাজতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় তরকারি পুড়ে গিয়েছিল এবং পুরো রুম ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন জোরে জোরে ফায়ার
এলার্ম বাজতেছিল। পরে শুনলাম, অতিরিক্ত ধোঁয়া হলে অটো সেনসেশনের সাহায্যে মেশিন এটা বুঝতে পারে এবং ধোঁয়া হলে এটি বিকট শব্দ করে মানুষকে সতর্ক করে। তো আমার রুমটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হওয়ায় এই সাইরেনের মতো শব্দ বাজতে থাকে। আমি দৌড়ে জানালাগুলো খুলে দিই এবং কিছুক্ষণ পর শব্দ থেমে যায়।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল স্বল্প সময়ের কানাডা সফর। আমার প্রেজেন্টেশনের শেষ দিনে আমি নিজেকে হালকা মনে করলাম। ওইদিন আমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একা একা ইউবিসি (ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া) আর প্রশান্ত মহাসাগরের পাশের পিচের সড়ক দিয়ে হেঁটে হেঁটে ডরমিটোরিতে ফিরছি। শরীর বেশ ক্লান্ত ছিল। মনটা ছিল কিছুটা এলোমেলো। কিছুদূর হাঁটতেই দেখি কিছু মানুষ, বিশেষ করে কাপল হাতে ব্যাগ, পানির ওপর ভেসে থাকার জন্য কাঠের পাতলা জিনিসপত্র নিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের মতো গুহার মধ্য দিয়ে নিচে নামছে। আমিও তাদের দেখাদেখি নিচে নেমেছি। ওপর থেকে বোঝা যায়নি। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমিও অনেক দূর নেমে এলাম। তারপরও মানুষ শুধু আসছে এবং যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আমি ১ কি.মি.র বেশি নিচে নেমেছি। এর

অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিচ পেয়ে গেছি। ওখানে একটা নোটিশ ছিলঃ 'ছবি তোলা নিষেধ'। আর কিছুদূর এগোতেই দেখি জাপানি ২/৩টা মেয়ে ল্যাপটপে কি জানি করছে। আর কিছুদূর এগোতেই দেখি বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। চোখ যতদূর যায় শুধু ধুধু ফাঁকা জলরাশি। কোথাও কেউ নেই। শুধু জ্যাকেট পরিহিত ২-৩ জন স্পিডবোট নিয়ে পাড়ের দিকে টহল দিচ্ছিল। বিচের একদিকে বেশ কয়েকজন মিলে হ্যান্ডবল খেলছে। এদের মধ্যে ৫-৬ বছরের ছোট বাচ্চারাও আছে। প্রচুর বালি আর পাথর। অনেকে বই পড়ছে। অনেকে সাঁতার কাটার জন্য সাগরে নামছে। সব বয়সেরই মানুষ। সান বাথ করছে। এত সাদা চামড়ার মধ্যে দু-একজন কালো কিংবা বাদামি চামড়ার মানুষও খুঁজে পেয়েছি। তীব্র দাবদাহ। ওই দিনও আমি রোজা রেখেছিলাম। বিচটির নাম রিক বিচ। এখানে যে কাপড় না পরলেও চলে-এটা আমার জানা ছিল না। এতগুলো নগ্ন মানুষ আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি। নিজের বিবেকের তাড়নায় তাড়াতাড়ি বিচ থেকে চলে এলাম। আসলে এটা তাদের কালচার। তারা এটা কিছুই মনে করেনি। জীবন যেখানে যেমন, তেমনই থাকতে হয়।

আরও দু-একদিন হাতে সময় আছে। আমরা চলে গেলাম ভ্যানকুভারের ডাউন টাউন দেখতে। অনেক দোকান আছে। মসজিদও পেয়েছি। অনেক ইন্ডিয়ানকে দেখলাম ওইসব জায়গায় কাজ করছে। কেউ গাড়ি চালাচ্ছে, কেউ দোকানদারি করছে, কেউবা ছোটখাটো কোম্পানিতে কাজ করছে। একজন বাঙালি আমাদের অনেক সিনিয়র বাকৃবির বড় ভাই আবু আলী ভাই ভ্যানকুভারে আছেন অনেকদিন ধরে। ওনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হলো। উনি বাসায় দাওয়াত দিলেন। আমরা গেলাম। সুন্দর কানাডার স্টাইলে বাসার আসবাবপত্র সাজানো। বাঙালি আরও দু-একজনকে ইনভাইট করলেন। সবাই একসঙ্গে বসে খেলাম। গল্প-গুজব হলো বাঙালি আমেজে। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, ততক্ষণ বাকৃবির বিভিন্ন হলের, ফ্যাকাল্টির গল্প শুনলাম, বললাম। বাঙালিরা ওখানে কীভাবে আছে-নানারকম আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে।

একবার আমরা দূরের একটি শপিং মলেও গিয়েছি। নামটি মনে নেই, তবে আমাদের দেশের বসুন্ধরা সিটির মতো। বেশ উঁচু। ১৫-২০ তলা ভবনটি। একেকটি জায়গায় একেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, এক জায়গায় নানারকম খাবার পাক করছে আর বিক্রি করছে। কেউ পাশে বসে টেবিলের চারপাশে চেয়ার নিয়ে খাচ্ছে। কেউবা আবার খাবার হাতে নিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে খাচ্ছে। শপিং মলের কিডস কর্নার, ফুডস কর্নার, কসমেটিকস কর্নার ইত্যাদি আলাদা আলাদা ছিল। এত সিস্টেমেটিক শপিং মল আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

পরদিন নর্থ ভ্যানকুভারে গেলাম। লিন ক্যানন পার্ক দেখতে গেলাম। একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারের নামানুসারে পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে। এটা মিউনিসিপ্যাল সিটির অধীন। পার্কটিতে প্রচুর গাছ। তবে কোনো ফলের গাছ

নেই। কাঠ দিয়ে তৈরি বসার জায়গা। পুরো পার্কটি আনুমানিক ৬০০ একরের বেশি জায়গা নিয়ে আছে। একদম পিনপতন নিস্তব্ধতা। মানুষের আনাগোনা একেবারেই নেই বললে চলে। এই তীব্র তাপের মাঝে এই পার্কটিতে না ঘুরলে জীবনের কিছু অংশ হয়তো বাকি থেকে যেত। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পেয়ে গেলাম একটি সাসপেনশন-ঝুলন্ত ব্রিজ। লোহার রশি দিয়ে এত সুন্দর করে তৈরি করেছে যে, দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। দুপাশের লোহার রশি দিয়ে মাঝে কাঠের তৈরি পাটাতন দিয়ে

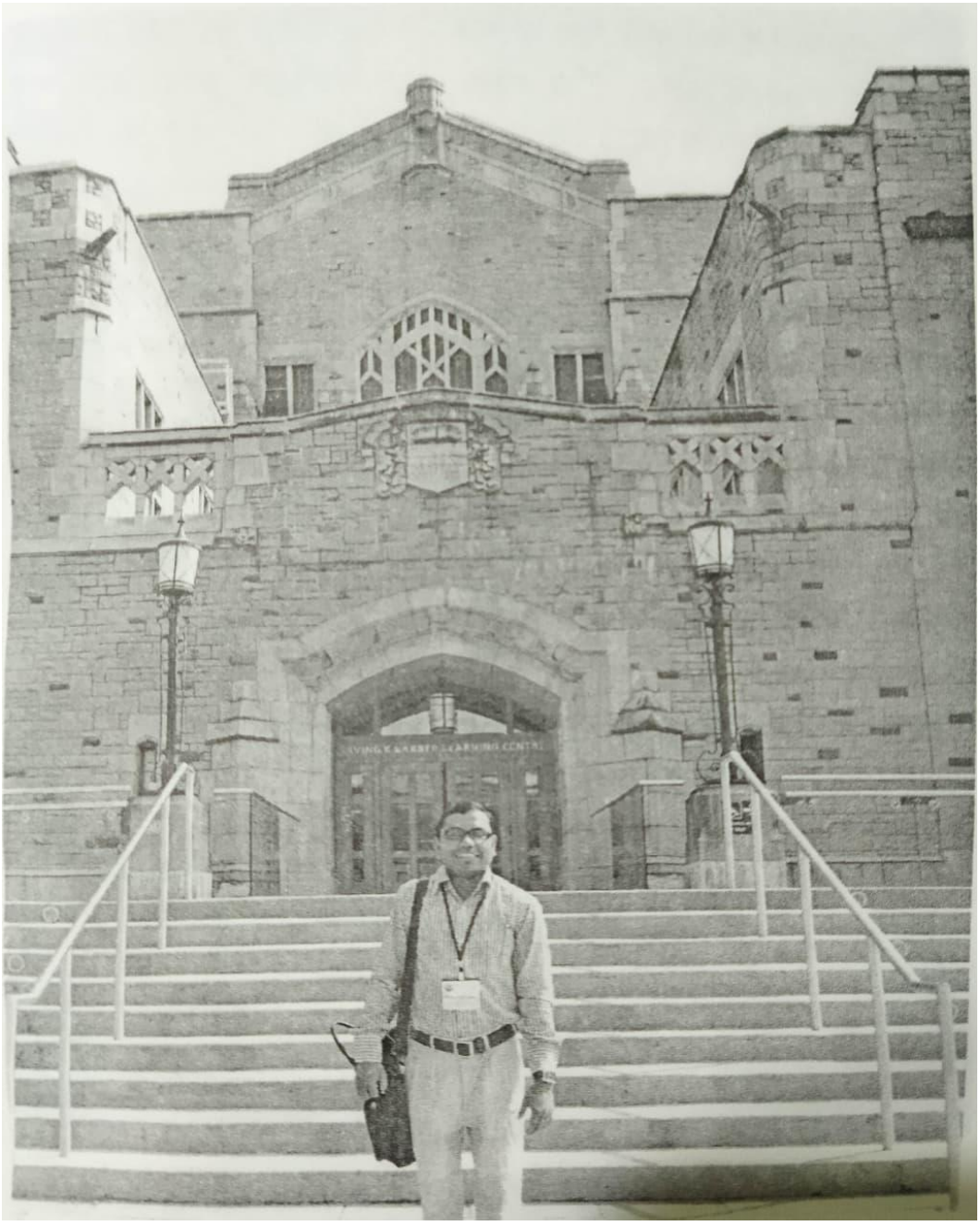

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সামনে লেখক

দুপাশের পাহাড়ের মাঝে এমনভাবে ঝোলানো ছিল যে, দেখলে মন ছুঁয়ে যায়। ব্রিজ থেকে নিচে তাকালে ছলছল করে পানির প্রবাহ দেখা যায়। পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য এখানে লুকিয়ে আছে। এটা শেষ করে আমরা ভ্যানকুভারের আরও কিছু সাইট দেখে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম।
ভ্যানকুভারের ডাউন টাউনে অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং রয়েছে। রাস্তাঘাট একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শপিং মলগুলোতে জাপানের মতো ছোট ছোট প্যাকেট কিংবা তরমুজ কেটে কেটে বিক্রি করে না। বরং খাবারের জিনিস অনেক বড় বড় প্যাকেট করে বিক্রি করে। ওখানে মানুষজন সম্ভবত বেশি বেশি খায় এবং কেনাকাটাও করে বেশি। নানা বর্ণের ও রঙের মানুষ ভ্যানকুভারে। ম্যাপল পাতার এই কানাডা সত্যিই অপরূপ সুন্দর। ভ্যানকুভার কানাডার অন্য যেকোনো শহরের চেয়ে আবহাওয়া ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে ভালো। এটি প্রায় সময়ই বিশ্বে বেস্ট লিভিং তালিকার শহরের প্রথমদিকে জায়গা করে নিয়েছে।

আমরা ভ্যানকুভারে অ্যাকোরিয়ামও দেখেছিলাম। ১৯৫৬ সালে অ্যাকোরিয়ামটি খোলার পর এখানে ১৬০টিরও বেশি ডিসপ্লে দেখানো হয়।

সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল, এখানে নানারকম পেঙ্গুইন, ডলফিন, কিছু সামুদ্রিক মাছ আর উইড ছিল, যেগুলো একটি কাচের বক্সের ভেতর রেখে দিয়ে পুরোপুরি প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর করা ছিল। নানা প্রজাতির মাছ, ডলফিন, সামুদ্রিক উইড দেখে আমরা ঢুকলাম একটি মুভি রুমে। সেখানে থ্রিডি আকারে ছবি দেখানো হয়। ছবি দেখার পর এসে দেখলাম একটি ভয়ংকর মুহূর্তে সবার ওপরে এসে তুষারপাত করা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। নানা আশ্চর্যে ভরপুর ছিল এই অ্যাকোরিয়াম দেখতে।

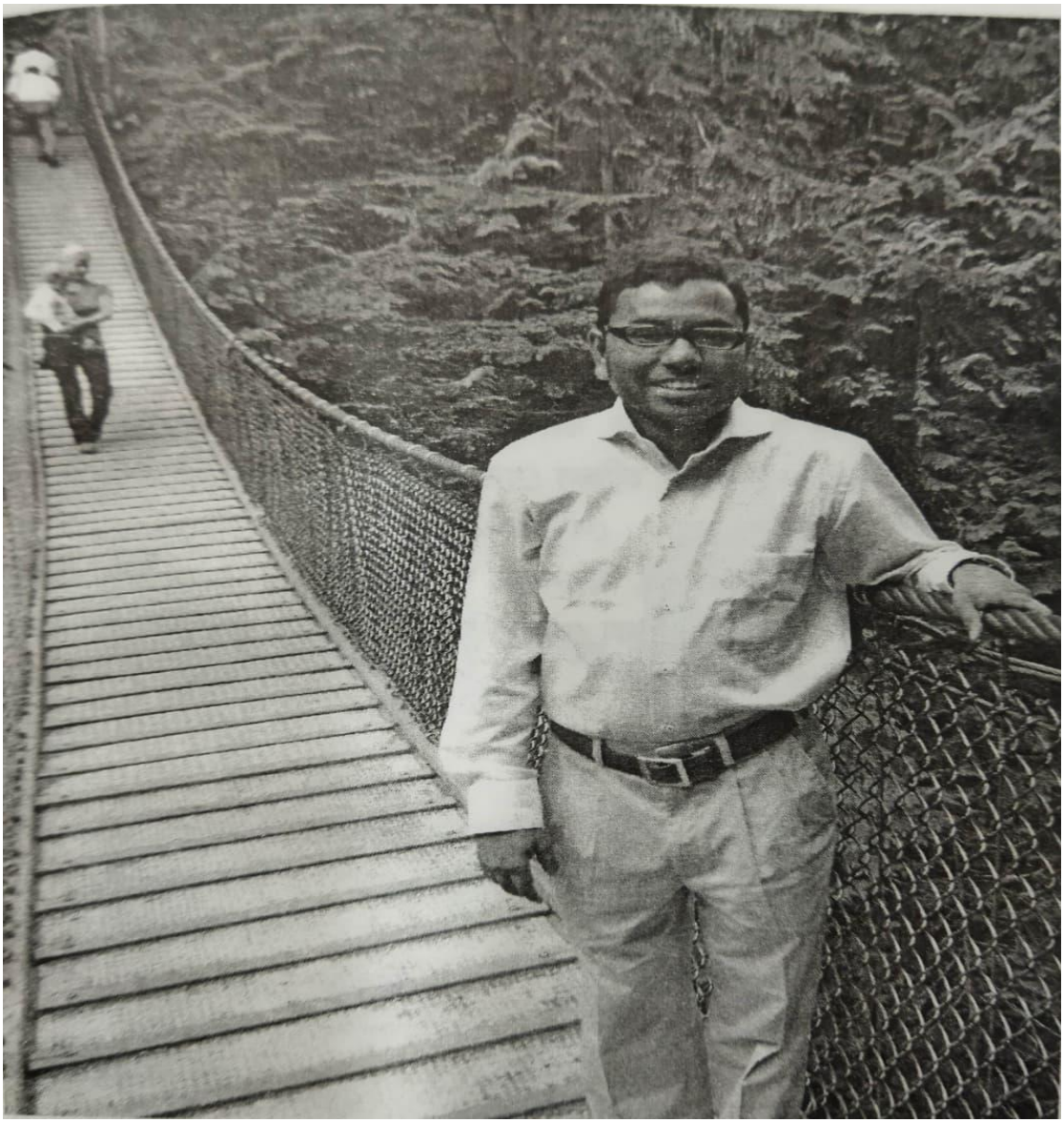

কানাডার ভ্যানকুভারের লিন ক্যানন পার্কের ঝুলন্ত ব্রিজে লেখক

ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জর্জ ভ্যানকুভার ১৭৯২ সালে সর্বপ্রথম এখানে নোঙর করেন তার জাহাজ। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই ভ্যানকুভার শহর। স্ট্যানলি পার্ক একেবারে সমুদ্রের খুবই কাছে। পার্কটির তিন পাশেই পানি। শুধু একপাশে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে লাগানো। ব্রিটিশরা এখানে কলোনি গড়ে তোলার আগে আদিম স্থানীয় লোকজন এখানে থাকত। সমুদ্রের খুব কাছে বলে পার্কটির সৌন্দর্য অন্য যেকোনো পার্কের চেয়ে ভিন্ন ছিল। এর পাশেই ইংলিশ বে দেখার জন্য আমরা গেলাম। সেখানে প্রথমেই আমরা টিকিট কাটলাম। তারপর সুমিডা শেনসি, আমি আর কোমাকি সান তিনজন মিলে মোটামুটি মাঝারি সাইজের একটি নৌকায় উঠলাম। ধীরে ধীরে নৌকাটি বে-এর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে রওয়ানা হলো। চলার মাঝে দেখলাম এক জায়গায় অনেক 'সি বার্ড' জড়ো হয়ে আছে। এলোমেলোভাবে উড়ছে। নৌকাটি দোতলা ছিল।

দোতলায় গিয়ে দেখলাম একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতা, অন্যদিকে জবা আর বেলি ফুলের পাপড়ির মতো সাজানো ভ্যানকুভার শহর। নৌকাটি তার নির্দিষ্ট পথ বেয়ে আবার আগের জায়গায় চলে আসছে। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। সূর্যের লাল রশ্মি যখন ভ্যানকুভার শহরের ওপর পড়ছিল, তখন সুউচ্চ বড় বড় বিল্ডিংকে মনে হচ্ছিল যেন এরা সূর্যরশ্মির আহ্বানে নিজেদের হাত আকাশের দিকে বাড়াচ্ছে। লোকজন কম। পুরো পোর্টটিকে মনে হলো সাগর আর মানুষের এক মধুর মিলনস্থান। যে যার কাজ করছে। সবকিছুই সিস্টেমিক ওয়েতে চলছে। নৌকা থেকে শহরকে যেরকম দেখেছি তা আমার হৃদয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে।

তারপর আমরা পাড়ে এসে সি ওয়াল দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম। একদিকে সাগর আর অন্যদিকে পাহাড়। আর দুয়ের মাঝে ছোট লম্বা সরু পথ। কেউ জগিং করছে, কেউ সাইকেল চালাচ্ছে আবার কেউ কেউ আমাদের মতো হাঁটছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই শান্ত রূপ আর পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য-এর মাঝখানে আমরা যখন হাঁটছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে, আমরা কোনো স্বপ্নপুরীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কোথাও কোনো শব্দ নেই। প্রকৃতির এক বিরল দৃশ্য দেখছি। মাঝে মাঝে দু-একটি বিমান মাথার খুব কাছ দিয়ে আসছে। কাছেই হয়তো বিমানবন্দর। প্রকৃতির সঙ্গে ধরণির এই মানবিক সম্পর্ক স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না। এভাবেই আমরা আমাদের ডরমিটোরিতে চলে এলাম।

পরের দিন কংগ্রেসের শেষ ডিনার পার্টি ইউনিভার্সিটির এক প্রান্তে বিরাট আয়োজন। এক টেবিলে আমরা সবাই বসলাম। আমরা হালকা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলাম। পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশ থেকে ১০০০-এরও বেশি হার্পেটোলজিস্ট এবং ইথোলজিস্ট সেখানে এসেছিল। প্রথমেই ছিল বক্তব্য এবং নানারকম নাচ-গান, মদ ও হুইস্কির ছড়াছড়ি। ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, মরক্কো আর কানাডার কিছু ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গান গেয়েছিল আর নেচেছিল। দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য ছিল। আমার সঙ্গে কিছু সায়েন্টিস্টের পরিচয় হয়েছিল। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এখন নেই। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির কিউরেটর ডেরেল ফ্রস্ট। তার সঙ্গে ছবি তুললাম। সে আমাকে বাংলাদেশ থেকে নতুন প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ দিল। পরে দু-একবার তার সঙ্গে আমার মেইলে যোগাযোগও হয়েছে। আরও অনেক নামকরা ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এক পর্যায়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা আমাদের ডরমিটোরিতে ফিরে আসি।

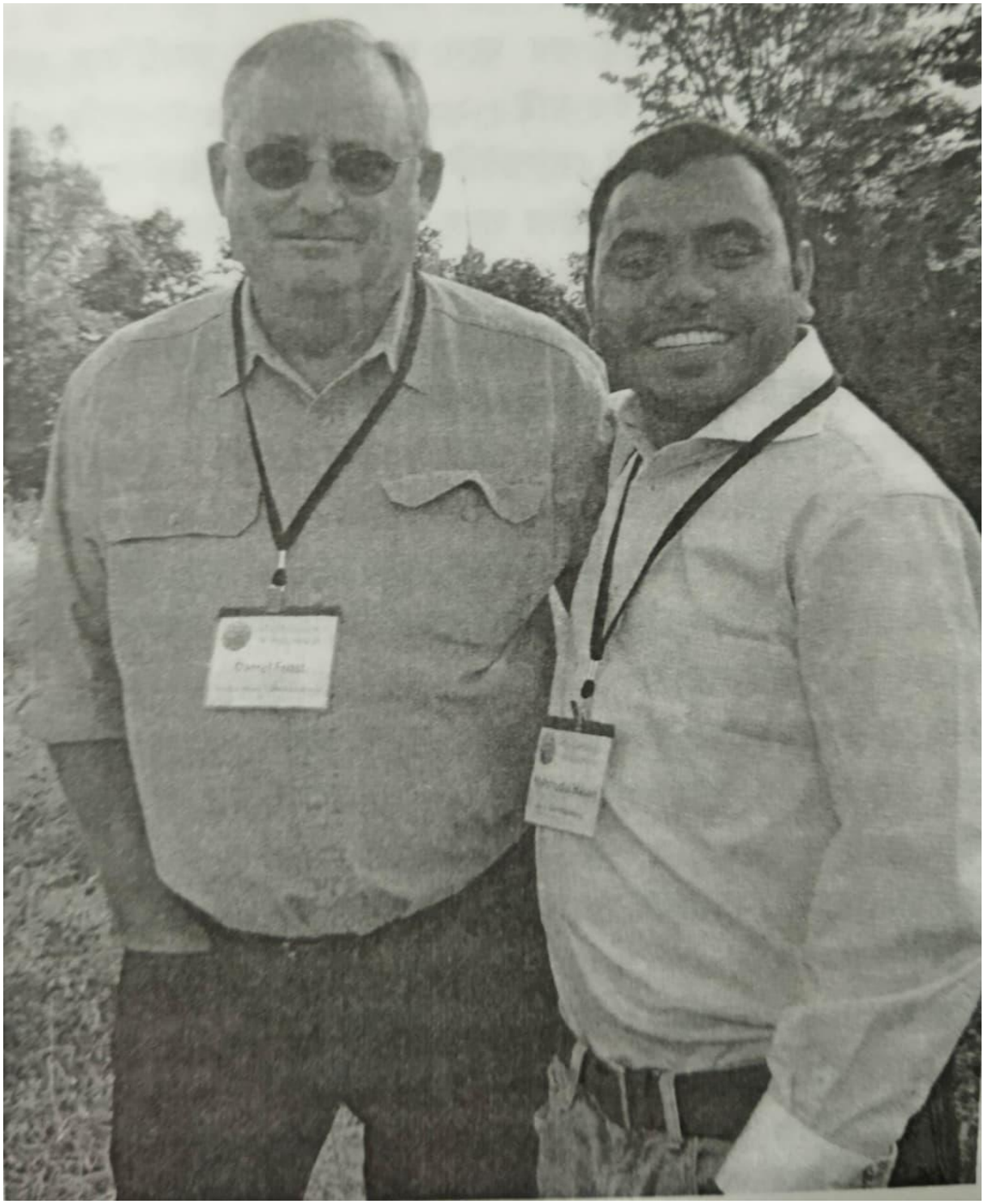

আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির কিউরেটর ডেরেল ফ্রস্টের সঙ্গে লেখক

পরের দিন ছিল আমাদের ফ্লাইট। আমরা সময়মতো ভ্যানকুভার এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে আমরা বিমানে উঠি। তখন দেখা যায় যে, আমাদের কারো কারো লাগেজ ওভার ওয়েট হয়ে গেছে। এগুলো বাতিল করে নতুন করে প্যাক করে আমরা বিমানে উঠলাম। ১০-১২ ঘণ্টার জার্নিতে টোকিও

পৌঁছলাম। টোকিও থেকে হিরোশিমা এবং হিরোশিমা এয়ারপোর্ট থেকে যার যার বাসায় ফিরলাম।

অস্ট্রেলিয়া টুর

জার্মানি আর কানাডা টুরের পর মনে হলো এবার অস্ট্রেলিয়া যাই। সুযোগ খুঁজতে থাকি। পেয়েও যাই। ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া সোসাইটি অব হার্পেটোলজিস্টদের ৫০তম কনফারেন্স ছিল। সুমিডা শেনসির সঙ্গে আলাপ করলাম। শেনসি রাজি হয়ে যায়। আমিও অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিই। সবকিছু ওকে হয়ে যায়। ২৮ জানুয়ারি আমরা হিরোশিমা থেকে ২টা ২০ মিনিটে ফ্লাই করে বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে নারিতা চলে এলাম। ওইদিনই রাত ৭টা ৫০ মিনিটে নারিতা থেকে কোয়ান্টাস বিমানের কোনো এক ফ্লাইটে সিডনির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। প্রায় ১০ ঘণ্টার জার্নি ছিল। সিট ছিল ৬৩ কে, জানালার পাশে। রাত ছিল বিধায় জানালা দিয়ে রাতের তারা জ্বলমল আকাশ দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন রাতের জ্যোৎস্নার আলোয় নিজেকে সঁপে দিই। তাড়াহুড়ার ক্ষণিকের সেই সময়কে আজীবন কাছে পেতে চেয়েছি। জীবনে চলার পথে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যাকে ফ্রেমে বেঁধে রাখতে ইচ্ছে করে। যখন খুশি তখন দেখতে চাই। কিন্তু আমরা কি সব সময় তা পারি? পারি না। কিন্তু সেইসব স্মৃতি জীবনের ওপর এমন কিছু প্রভাব ফেলে, যা সারা জীবন মানুষকে একটা কল্পনার জগতে হাসায়-কাঁদায়।

পরের দিন আনুমানিক সকাল ৮টার দিকে সিডনি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার আগে বিমানটি আকাশে কয়েকবার চক্কর দিয়েছিল। সম্ভবত বিমানটি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার অনুমতি পাচ্ছিল না। আমরা কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে সিডনি এয়ারপোর্টে বিমানটি ল্যান্ড করল। ইমিগ্রেশন প্রসিডিউর শেষ করে আমরা লোকাল ফ্লাইট ধরার জন্য সিডনি এয়ারপোর্টেরই লোকাল টার্মিনালে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম। ওয়াইফাই দিয়ে কিছু মেইলের কাজ সেরে নিলাম।

ছোট বিমানে ফ্লাই করার অভিজ্ঞতা আমার কম ছিল। অস্ট্রেলিয়ার পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের বিমান চলছিল। তখন সকাল সাড়ে নয়টা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ছিল। একজন মাত্র বিমানবালা ছিল আর আপ্যায়ন হিসেবে শুধু চকলেট দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া তো একটি দ্বীপ। দ্বীপের চারপাশে মানুষের বসতি। কিন্তু মাঝখানে শুধু পাহাড় আর অরণ্য। বিমানের জানালা দিয়ে তাকিয়ে শুধু আমি ওইসব চিরহরিৎ অরণ্য আর উঁচু-নিচু পাহাড় দেখছিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা ক্যানবেরা এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। সেখানে সীমিত আকারে চেক হলো। ইমিগ্রেশন গেট পার হয়ে বাইরে বের হলাম। আমাদের কনফারেন্স ভেন্যু মূলত 'গ্রিন হিলস সেন্টারে'। সেখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। এক সময় গ্রিন হিলসে গিয়ে উঠলাম। আমরা ২৯ জানুয়ারির দুপুরের মধ্যে কনফারেন্স ভেন্যুতে পৌঁছলাম। আমাদেরকে রিসিভ করার মতো তেমন কেউ ছিল না। অনেক

খোঁজাখুঁজির পর একজন এসে আমাদেরকে অ্যাকমোডেশনের জায়গা দেখিয়ে দিল। জায়গাটি একেবারে চাকচিক্যবিহীন। থাকার ঘরটি বাংলাদেশের সাধারণ একতলা বিল্ডিংয়ের মতো। ছোট ছোট সিট। একরুমে কয়েকজন থাকতে হয়। আমি আর শেনসি বি-ব্লকের ৬নং রুমে লাগেজ রেখে বের হলাম। খাওয়ার মতো তেমন কোনো রেস্টুরেন্ট নেই। এই সেন্টারটা মূলত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাড়া নেয় এবং বনভোজন করে। ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি নেই বললেই চলে। একেবারে অজপাড়াগাঁয়ের গ্রামীণ পরিবেশ। সন্ধ্যার দিকে প্রচুর ক্যাঙ্গারু (অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রাণী) দেখলাম। ওরা আশপাশের জঙ্গল থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলে এসেছিল। খুব কাছ থেকে ওদের দেখলাম। তারপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বের হয়ে পড়তাম ওদের দেখার জন্য। ওরা শুধু সন্ধ্যায় নয়, প্রায় সারা দিনই দু-চারটে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। গ্রিন হিলসে পরের দিন কনফারেন্স শুরু হলো। সন্ধ্যার দিকে খাবার খেতে দিল।

অস্ট্রেলিয়া সোসাইটি অব হার্পেটোলজিস্টদের ৫০তম কনফারেন্সে অন্যান্য অতিথির সঙ্গে লেখক

হঠাৎ দেখলাম মিগুয়েল বেনসেস জার্মান থেকে এলো। ওর সঙ্গে আমার আগে থেকেই কিছুটা পরিচয় ছিল বিধায় অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলাম। অস্ট্রেলিয়ার এই কনফারেন্সে প্রায় অস্ট্রেলিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই লোকজন এসেছিল। আমার দেখা হয়েছিল শ্রীলঙ্কার একটি মেয়ের সঙ্গে। সে

অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এমএস করছিল। এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। শেষদিনে সবাই বুফে স্টাইলে খাওয়া-দাওয়া করল। আর আমরা সবাই মিলে গ্রুপ ছবি তুলেছিলাম। এর পরের দিন আমি আর সুমিডা শেনসি গ্রিন হিলস থেকে ক্যানবেরা চলে এলাম। আসার পথে অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দেখে এলাম। ক্যানবেরায় একটি হোটেলে উঠলাম। আগেই বুকিং দেওয়া ছিল। সেখানে একজন পরিচিত বড় ভাইয়ের মাধ্যমে প্রথমেই আমরা অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়াম অস্ট্রেলিয়ান এবওরজিনদের অনেক কালেকশন আছে। অস্ট্রেলিয়ার নানারকম ইতিহাস, ছবি, দামি পেইন্ট ইত্যাদি আছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিধায় সামনের দিনগুলোয় হয়তো আরও বেশি কালেকশন হবে।
তারপর আমরা চলে গেলাম অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট ভবন দেখতে। তাপমাত্রা খুব বেশি ছিল। চারপাশে দেখলাম ক্যাঙ্গারু এবং ইমু দ্বারা গঠিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পতাকা। একটি পতাকা পার্লামেন্টের ওপর পিলার দ্বারা স্থাপিত। সামনে পানি আর বিশাল মাঠ। নতুন এই পার্লামেন্ট ভবন ১৯৮৮ সালে খুলে দেওয়া হয়। এই বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল সবুজ দূর্বা ঘাসে ঘেরা আর তার পাশেই বিশাল রাস্তা। এই রাস্তা ধরে আমরা কিছুদূর হেঁটে এসে বাঙালিদের কিছু দোকান দেখলাম। দু-একজনের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তো এই দিন বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে হোটেলে চলে এলাম। হোটেলে কমন প্লেসে রান্না করার সুযোগ ছিল। আমরা দুজনে মিলে রান্না করে রাতে খেয়ে নিলাম। তারপর এক প্রশান্তির ঘুম।

পরের দিন রোববার ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে আমাদের ফ্লাইট ছিল ক্যানবেরা টু সিডনি। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ফ্লাই করে ১১টা ২০ মিনিটে আমরা সিডনিতে পৌঁছে গেলাম। আমার স্কুলবন্ধু শাকিলের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। সে আগে থেকেই এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল। সেখান থেকে শাকিলের গাড়িতে করে তার বাসায় ল্যাকেম্বায় পৌছলাম। ভাবি নানারকম তরকারি আর বাঙালি স্টাইলে একটু ঝাল দিয়ে গরুর গোশত রান্না করেছিলেন। একটি সুন্দর গোসল করে আমরা বাহারি রকমের ভর্তা, সবজি, মাছ আর গোশত নিয়ে খেতে বসেছিলাম। অনেক বেশি খেয়েছি। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে শাকিলের গাড়িতে করে আমরা ল্যাকেম্বা থেকে প্রায় ১০০ কি.মি. দূরের জ্যামসন ভ্যালির 'থ্রি সিস্টার্স' দেখতে গিয়েছিলাম। বিকেল বেলা, সূর্য একটু হেলে গিয়েছে। সূর্যের আলো যখন 'থ্রি সিস্টার্স'-এর গায়ে পড়েছিল তখন কিছুটা খয়েরি আর হলুদাভ রং ধারণ করেছিল। পেছনেই বিশাল পাহাড় আর সবুজ অরণ্য। এই 'থ্রি সিস্টার্স' মূলত দীর্ঘকালের বাতাস, পানি আর নানারকম প্রাকৃতিক কারণে ইরোশন হয়ে তৈরি হয়েছে। 'থ্রি সিস্টার্স'-এর গায়ের প্রকৃত পাথর কিছুটা নীল দেখা যায়, যখন কোনোরকম সূর্যরশ্মির বিকিরণ না ঘটে। দূর থেকে 'থ্রি সিস্টার্স'কে দেখলে মনে হয় যেন তারা সমান দূরত্ব মেইনটেন করে আবহমান কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কথিত আছে যে, মেহনি, উমলা এবং গানডু নামক তিনজন বোন কাটম্বো

উপজাতির জ্যামসন ভ্যালিতে বাস করত। তারা তিন বোন পাশের নিপিয়ান উপজাতির তিন ছেলের প্রেমে পড়েছিল।
কিন্তু প্রথাগত বিরোধের কারণে তাদের প্রেম পরিপূর্ণতা পায়নি এবং তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারেনি। এই দুঃখে কাতর হয়ে তিন যুবক সিদ্ধান্ত নেয় যে, তিন মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে আসবে। কিন্তু মেয়ের এক বড় ভাই তাদেরকে এই অপহরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তিন বোন 'থ্রি সিস্টার্স' মূর্তি লাভ করে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির জ্যামসন ভ্যালির 'থ্রি সিস্টার্স'-এর সামনে লেখক

হাজারো মানুষের ভিড়ে আমি আর সুমিডা শেনসি অনেক ছবি তুলি। পাহাড়ের মাঝে এলোমেলো বাঁকা পথে হাঁটি। অস্ট্রেলিয়ার সত্যিকারের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হই। হাজার বছর ধরে এগুলো এভাবেই আছে। মানুষ এখনো অনেক

কিছুই এক্সপ্লোর করতে পারেনি। অনেক কিছুই এখনো অজানা, অচেনা রয়ে গেছে। এভাবে আমরা আমাদের ওই দিনের টুর শেষ করে বাঙালি অধ্যুষিত সিডনির ল্যাকেম্বায় শাকিলের বাসায় চলে আসি।

পরের দিন সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি সকালে শাকিল আমাদেরকে ট্রেনে করে সিডনি অপেরা হাউস দেখাতে নিয়ে যায়। দূর থেকে দেখতে অপেরা হাউসটি একটি ফুটন্ত ফুলের মতো দেখা যায়। এতদিন এটা বিভিন্ন ক্যালেন্ডার, পত্রিকায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। আজ বাস্তবে দেখার সুযোগ হলো। অপেরা হাউসে যাওয়ার পথে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখেছি। এটা মূলত প্যাসিফিক ওশান থেকে যে ইনলেট ভেতরে ঢুকেছে তার পাশেই গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির এক অপরূপ দৃশ্য নিয়ে অপেরা হাউস দাঁড়িয়ে আছে। তিন দিকে পানি এবং একদিকে এটি মেইন ল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। তো যাওয়ার পথে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রেমিক-প্রেমিকা, যুবক-যুবতিকে দেখলাম হারবারের পাড়ের পাথরে কিংবা ওয়ালে বসে আছে। এরা মূলত রিক্রিয়েশন পারপাসে এসেছে। নানারকম জিনিসপত্র ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে, বিশেষ করে মজাদার খাবার। মানুষ হরদম এগুলো কিনছে আর খাচ্ছে। অনেক এশিয়ান, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান আর চাইনিজদের রাস্তায় দেখলাম। অপেরা হাউসের সামনের দিক দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। ওখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। বিংশ শতাব্দীর এটি একটি বিখ্যাত স্থাপনা। ১৯৫৯ সালের ২ মার্চ কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হলেও ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর এটা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটা রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং সিডনি হারবার ব্রিজের খুব কাছেই অবস্থিত। এখানে বছরে প্রায় ১.২ মিলিয়ন মানুষ নৃত্য, সংগীত ইত্যাদি কাজে যোগদান করে। বছরে প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ এটা ভিজিট করে। ২০০৭ সালের ২৮ জুন এটা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিল্ডিংটি ১.৮ হেক্টর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্য ১৮৩ মিটার, প্রস্থ ১২০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৬৫ মিটার। যখন আমরা অপেরা হাউসের একদম নিচে গেলাম, তখন জাস্ট মনে হয়েছিল যেন একটি সাধারণ বিল্ডিংয়ের নিচে এলাম। সামনে প্রশস্ত মাঠ আর কিছু টুরিস্ট। বসে অনেকক্ষণ ছবি তুললাম আর গল্প-গুজব করলাম। ওই দিন আবার দেখলাম যে, অস্ট্রেলিয়ান এক কাপলের বিয়ে। তারা একটা নৌকা সাজিয়ে বর ও কনেকে নৌকায় তুলে অপেরা হাউসের তিন দিকেই ঘুরছে আর টুরিস্টদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। জীবনকে উপভোগ করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা সিডনির এই অপেরা হাউস এবং এর পাশের এলাকা। অপেরা হাউসের উলটোপাশে কিছু বাড়ি দেখেছি। যেসব লোক ওই বাড়িগুলোতে থাকে, তারা অনেক লাকি। কারণ, তারা একদিকে নির্মল বায়ু সেবন করছে আবার অন্যদিকে উপভোগ করছে অপেরা হাউসের আর হারবার ব্রিজের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। বিশেষ করে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন প্রকৃতির এই অপরূপ লীলা দেখা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

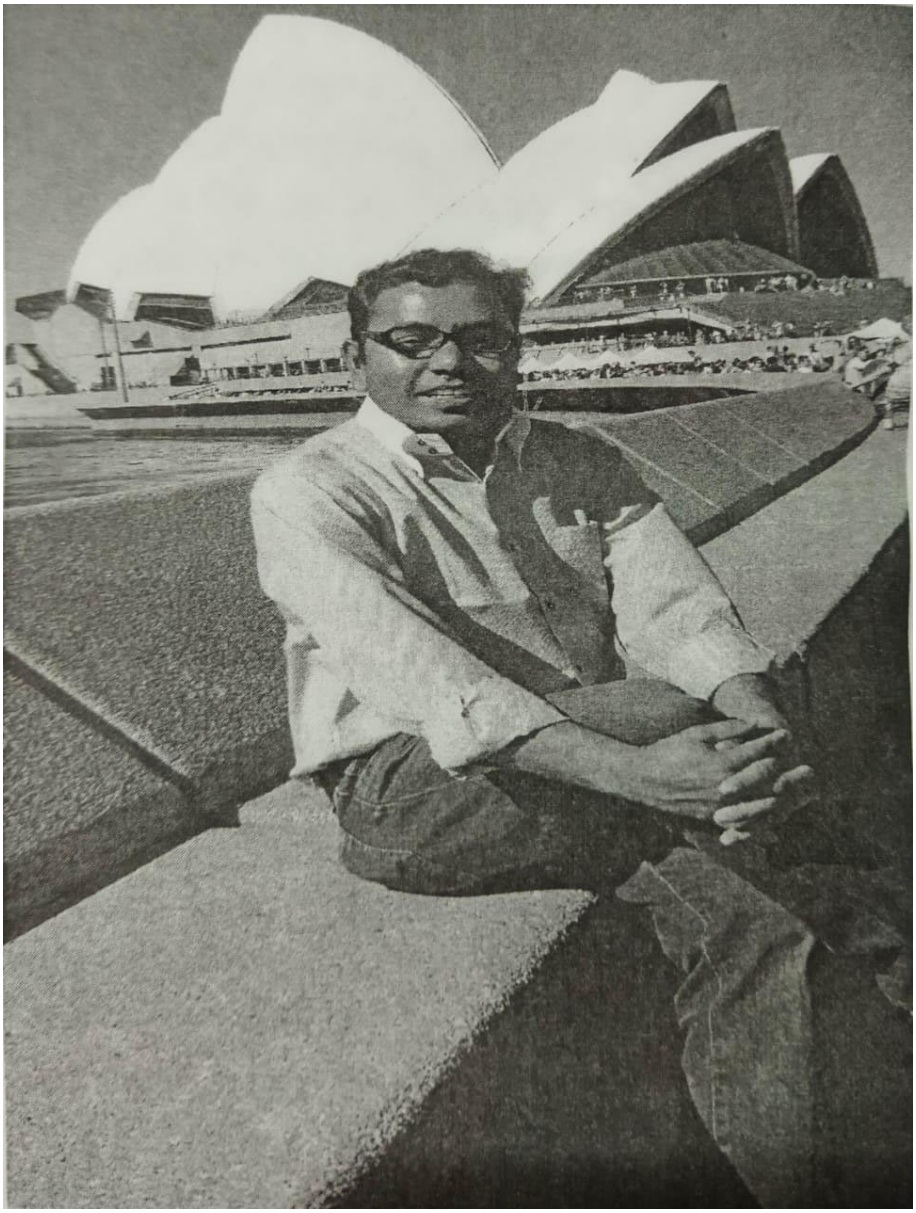

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অপেরা হাউসের সামনে লেখক

তারপর আমরা চলে গেলাম সিডনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে। অপেরা হাউস থেকে হেঁটে সেখানে যাওয়া যায়। বোটানিক্যাল গার্ডেনে নানারকম উদ্ভিদ আছে। গার্ডেনের মাঝে আঁকাবাঁকা ছোট ছোট রাস্তা। লোকজন খুব বেশি মনে হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে দেখি ছোট একটি আমগাছ। গাছটিতে হাজারো আম। মনে হচ্ছিল এ যেন ছোট্ট এক বাংলাদেশ। তাপমাত্রা ও আবহাওয়ায় বাংলাদেশের পুরো আমেজ ছিল। জার্মানির বোটানিক্যাল গার্ডেনের তুলনায় সিডনির এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবশ্যই উদ্ভিদের সংগ্রহ অনেক কম। হাঁটতে হাঁটতে পুরো বাগানটি একবার ঘুরে দেখলাম। তারপর সেখান থেকে হেঁটে সিডনি হারবার সেন্টারে চলে এলাম।

টিকিট কেটে আমরা সিডনি হারবার সেন্টার থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠলাম। এটি প্রথমে নর্থ শোরের দিকে গিয়ে হারবার ব্রিজের নিচ দিয়ে পশ্চিম দিকে টার্ন নিল। ব্রিজটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১,১৪৯ মিটার, প্রস্থ ৪৮.৮ মিটার এবং উচ্চতা ১৩৪ মিটার। ২৮ জুলাই ১৯২৩ সালে ব্রিজটির নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ১৯ জানুয়ারি ১৯৩২ সালে শেষ হয়। তারপর মানুষের চলাচলের জন্য ১৯ মার্চ ১৯৩২ সালে ব্রিজটি খুলে দেওয়া হয়। আট লেনের এই ব্রিজটিতে দৈনিক হাজারো মানুষ সিডনির মূল শহর থেকে নর্থ শোরের দিকে যায়। আবার নর্থ শোর থেকে কাজের উদ্দেশ্যে সিডনিতে আসে। এই ব্রিজে হাঁটা, সাইকেল চালানো, গাড়ি এবং ট্রেনের জন্য পৃথক পৃথক লেন আছে। এটা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্প্যান-আর্চ ব্রিজ। ব্রিজটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে মূলত নৌকার মতো স্টিলের যে ফ্রেম কার্ভ হয়ে আছে, সেটা। হারবারের স্বচ্ছ পানির ওপরে এটি দেখলে মনে হয়, আকাশ থেকে বাঁকানো একটি স্টিলের পাত ঝুলছে দুপাশের দুটি লাঠির ওপর দাঁড়িয়ে। এই হারবার ব্রিজ যেন সিডনিকে সৌন্দর্যের তালিকায় আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের বহনকারী ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি চলছে অবিরাম। দুপাশের সিডনি শহর মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নপুরী। কোনো এক অজানা শহরে নদীর বুকে ভেসে বেড়াচ্ছি। মনের সব অনুভূতি সিডনির দু'পারের বিল্ডিংগুলোতে যেন আদর করে আবার ফিরে আসে। একদিকে অপেরা হাউস অন্যদিকে হারবার ব্রিজ আবার অন্যদিকে সিডনি শহর। সব মিলিয়ে স্বপ্নের অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। নৌকা চলছে তো চলছেই। যেন মনে হলো, 'মাঝি বাইয়া যাও, যেন এর শেষ না হয়।' এভাবেই ধীরে ধীরে আমরা পৌঁছে গেলাম ডার্লিং হারবারে। এটা মূলত তৈরি করা হয়েছে রিক্রয়েশনাল পারপাসে। ২০০০ সালের গ্রীষ্মকালের অলিম্পিক গেমসের ভেন্যু ছিল এখানে। ডার্লিং হারবারে চাইনিজ গার্ডেন অব ফ্রেন্ডশিপ, সিডনি অ্যাকোরিয়াম, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম, সিডনি ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার আছে। এগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছি। মনের যতসব অতৃপ্তি ছিল এগুলো দেখে তা মিটে গেল। তারপর আমরা কাছেই চায়না টাউনে গিয়েছি। ১৮৫০ সালে প্রচুর চাইনিজ অস্ট্রেলিয়ায় যায়। পরবর্তী সময়ে এরা সিডনির আশেপাশে বাগানের মালী ও ছোটখাটো কাজ শুরু করে। এমনকি তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, তারা একটি কমিউনিটির মতো থাকতে শুরু করে। তারা নানারকম অপকর্ম ও পতিতালয়ের ব্যাবসা শুরু করে। সেখান থেকে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই চায়না টাউন আত্মপ্রকাশ করে। এখন এই চায়না টাউন ব্যাবসার একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কিনে পরে চায়নার টাউন হল হয়ে ট্রেন ধরে দুপুরের দিকে ল্যাকেম্বায় চলে আসি।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ডার্লিং হারবারে লেখক

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু রেস্ট নিলাম। ওইদিনই রাত ১০টা ২০ মিনিটে আমাদের ফ্লাইট সিডনি টু টোকিও। বিশ্রাম শেষে শাকিলের গাড়িতে করে সিডনি এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সঙ্গে শাকিলের মেয়ে, স্ত্রী লিনা আফরোজ ও সুমিডা শেনসি। যেহেতু আমাদের ফ্লাইট ছিল রাতে, সেহেতু প্রথমেই আমরা শাকিলের গাড়িতে করে ব্রিংটন বিচ-এ গেলাম। বিকেল বেলা। কী অপরূপ দৃশ্য! একপাশে সাগরের একটি অংশ আর অন্যপাশে সিডনি এয়ারপোর্ট। ব্রিংটন বিচ-এর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সিডনি এয়ারপোর্টে কীভাবে মিনিটে মিনিটে বিমান ল্যান্ড করে। ব্রিংটন বিচ-এর একপাশে আমরা দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ দেখলাম রশি দিয়ে একটি পাটাতনের মতো জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে পানি থেকে একটু উপরে আকাশে উঠছে আবার পরক্ষণেই পানিতে নেমে পড়ছে। আমার কাছে খেলাটি ভয়ংকর মনে হলেও লোকটি খুব আমোদে খেলে যাচ্ছিল। আমরা পাড়ের নুড়ি পাথর আর বিশালাকার পাথরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলাম। প্রচণ্ড বাতাস ছিল। বিকেলের হালকা রোদে আমরা যখন ব্রিংটন বিচ-এর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমরাই হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী কয়েকটি প্রাণী। কোনো টেনশন নেই। জীবনের এক অজানা গন্তব্যে শুধু হেঁটেই যাচ্ছি। একদিকে বিশাল সমুদ্রের নীরবতা আর অন্যদিকে ছুটে চলা দু-একটা গাড়ি। প্রকৃতির এমন নীরব

স্তব্ধতা আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। দূরের ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলমান গাড়িগুলোকে পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে চলছে বলে মনে হচ্ছিল। প্রকৃতির এই বিশালতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। পাড়ের বালি, পাথর, বে-র স্রোত, মৃদু হাওয়া, বিকেলের মিষ্টি রোদ আর কালো পানির সঙ্গে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। প্রকৃতির এত রূপ, সৌন্দর্য-এগুলো অবলোকন করে নিজেকে মনে হয়েছিল যেন শূন্য আকাশে শিমুলের তুলা হয়ে উড়ছি।

তারপর আমরা সবাই শাকিলের গাড়িতে উঠলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শোঁ শোঁ করে আমরা সিডনি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। গাড়ি থেকে আমি আর সুমিডা শেনসি নামলাম। শাকিল আর ভাবির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এমন সময় দেখলাম ভাবি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। শেনসির চোখেও পানি। আমিও কিছুটা কেঁদে ফেললাম। শাকিলও কিছুটা। পরিবেশটা গম্ভীর হয়ে গেল। যেন মুহূর্তের মধ্যে সাজানো বাগানে

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ব্রিংটন বিচে বন্ধু শাকিলের পরিবারের সঙ্গে লেখক

শিলাবৃষ্টি এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিল। যতদূর শুনেছি, ভাবি ঢাকার উত্তরার মেয়ে। ঢাকাতেই তার বেড়ে ওঠা। ওখানেই শাকিলের সঙ্গে দেখা। দেখা থেকেই প্রেম, তারপর প্রণয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা ভাবিকে ওইদিন দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। বাঙালি নারীরা এত মায়া-মমতা দেখাতে পারে আগে বুঝতে পারিনি। শতাব্দীর অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাস হয়ে আছে বাঙালি নারীদের মায়া আর মমতা নিয়ে। ওরা অতি অল্পতেই তুষ্ট, অল্পতেই প্রেমে পড়ে আর অতি অল্পতেই আবেগে ভাসে। হাসি আর কান্নাকাটি বাঙালি মেয়েদের অলংকার। ভাবি এত অল্প সময়ে আমাদেরকে এত বেশি আপন করে নিয়েছিলেন যে, সেই বিদায়ের বেলায় তার আবেগের মাত্রা ঝড়ো কান্নায় এসে থেমেছে। আমি তো বলব, বাঙালি মেয়েদের মন পৃথিবীর যেকোনো নারী জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যারা এত সহজে ভালোবাসায় মাখাতে পারে তারা কতটা সহজ, কতটা সরল- সেটা মনোবিজ্ঞানীদের দিয়ে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের এই আবহাওয়া, আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা মানুষগুলোই এত সহজ-সরল আর আবেগী হয়। কান্না মানুষকে হালকা করে; কিন্তু ভাবির সেইদিনের কান্না আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। একটি ভিনদেশে নিজের দেশের কাউকে হয়তো বিদায় দিতে গিয়ে এতটা মুষড়ে পড়েছিলেন ভাবি। ভাবির সেই কান্না আমাদের বাঙালির বৈশিষ্ট্য, আমাদের অহংকার, আমাদের সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। নানা ঘটনা অতিক্রম করে আমরা ওভারনাইটে সিডনি থেকে মঙ্গলবার ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা ২০ মিনিটে টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। নারিতা বিমানবন্দর থেকে হানেডা বিমানবন্দরে গেলাম। হানেডা বিমানবন্দর থেকে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে জাল এয়ারলাইনস (জাপান এয়ারলাইনস) ধরে ১টা ১০ মিনিটে হিরোশিমায় এসে পৌঁছলাম। অস্ট্রেলিয়ার এতসব আবেগ নিয়ে আমি কারাচে রতনের বাসায় গোধূলি লগ্নে পৌঁছলাম।

তাইয়ান টুর

এভাবে ভালোই যাচ্ছিল আমার দিনকাল। পোস্টডকে গবেষণার চাপ থাকলেও পিএইচডির মতো এত পেইন নেই। সাম্প্রতিক সময়ে আমি বাংলাদেশের হাইলারানা ব্যাঙ নিয়ে কাজ করি। হাইলারানা টাইপেহেনসিস এবং হাইলারানা টিটলেরি নিয়ে অনেক কনফিউশন। হাইলারানা টিটলেরি টাইপ লোকালিটি ঢাকা, বাংলাদেশ অথচ হাইলারানা টাইপেহেনসিস টাইপ লোকালিটি তাইপে, তাইওয়ান। তো আমি আর সুমিডা শেনসি দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম তাইওয়ান যাব এবং হাইলারানা টাইপেহেনসিসের কিছু নমুনা সংগ্রহ করব।

৩০ জুলাই ২০১৪ সালে সকাল ৯টায় আমরা হিরোশিমা থেকে রওয়ানা হয়ে আড়াই ঘণ্টার মতো জার্নি করে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় তাইপে এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। তাইওয়ান একটি দ্বীপের মতো। তাইওয়ানের মানুষ নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মনে করলেও চীন মনে করে তাইওয়ান তাদের একটি অঙ্গরাজ্য। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হোটেলে।

ওখান থেকে তাইওয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। সেখানে মি. লাই আমাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করলেন। আমরা একটা টিম হয়ে তাইওয়ানের দূরের পাহাড়ে গেলাম। পাহাড়ের চারপাশে আমরা স্যাম্পল কালেকশন করতে শুরু করলাম। ব্যাঙ পাওয়া এত সহজ না। তারপরও আমরা ধীরে ধীরে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরা সমুদ্র সমতল থেকে অনেক উপরে আছি। পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির খুব কাছ থেকে ব্যাঙ সংগ্রহ করলাম। সন্ধ্যার পর একটা ছোট ডোবার মতো জায়গায় গেলাম। এতে লাল শালুকের পাতা ও ফুল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট ডোবায় প্রচুর হাইলারানা ব্যাঙের ডাক। আমি তাদের কল রেকর্ড করার জন্য ভয়েস রেকর্ডারটি অন করলাম। কিন্তু একটা সিঙ্গেল কল রেকর্ড করতে আমার প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সাপ, বিচ্ছু আর ব্যাঙ-এই তিনের সংমিশ্রণে ওই জায়গাটি খুবই বিপজ্জনক ছিল। অন্ধকার রাতে টর্চ মেরে মেরে আমরা আমাদের স্যাম্পল কালেকশন করছিলাম।

তাইওয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গেটে লেখক

তাইপে একটি ছোট শহর। চারপাশে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। সভ্যতা যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে বলা যায়, তারা জাপানকে অনুসরণ করে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাইওয়ান ও জাপানের মধ্যে বর্তমানে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো হলেও বৃদ্ধ

তাইওয়ানিরা জাপানিদের এখনো ঘৃণা করে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সৈন্যরা অনেক তাইওয়ান নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। কালচার ও খাবার-দাবার কিছুটা মিল থাকলেও মূল নৈতিকতাবোধে দুটো জাতির মধ্যে বিস্তর ফারাক।

তাইপের ১০১ স্কাই বিল্ডিংও দেখেছি। একে বলা হয় তাইপে ওয়ার্ল্ড ফিন্যানশিয়াল সেন্টার। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা নির্মিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। নানারকম শপিং মল ও তাইওয়ানের লোকালি জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এটি তাইওয়ানিদের একটি অহংকার ও গর্বের বিল্ডিং।

তাইপে লাংসাম টেম্পল ও জুওলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেখেছি। চীন ও তাইপের শহর মোটামুটি একই রকম। একধরনের খাবার খেয়েছি যেটার চারপাশে আমরা বসেছিলাম তার চারপাশে খাবারের বড় চাকতিটা ঘুরে ঘুরে আসত। অনেকটা জুয়া খেলার চাকতির মতো। যে যেটা পছন্দ করত, সে ওই চাকতি থেকে নিয়ে নিত।

আমরা ইয়াংমিংশান ন্যাশনাল পার্ক ঘুরে ঘুরে দেখেছি। অনেক সুন্দর সবুজে ঘেরা পাহাড়ের মাঝখানে মজার বিষয়টি ছিল ডরমেন্ট ভলকানো সেভেন-স্টার মাউন্টেইন। এটার উচ্চতা প্রায় ১,১২০ মিটার। সেভেন-স্টার মাউন্টেনের পাদদেশে জিয়াউকেনগ নামক একটি জায়গা আছে। যেখান থেকে এখনো ধোঁয়া নিঃসৃত হচ্ছে এবং সালফারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার দেখা এটা একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো। সমুদ্র সমতল থেকে ৮০৫ মিটার উঁচু। খুব কাছ থেকে দেখলে ধূসর বর্ণের মনে হয়। কিন্তু একটু এগোলেই আর সালফারের গন্ধ পাওয়া যায় না এবং পাহাড়ের অন্য অংশে চির সবুজ। এভাবেই তাইওয়ান টুর শেষ করে আমরা পরের দিন ৫ আগস্ট হিরোশিমায় রাত ৮টায় চলে আসি।

জাপানি মেয়ে

দৈবাৎ জাপানি মেয়ে কেনজি শিওরির সঙ্গে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে আমরা বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠি। একদিন পড়ন্ত বিকেলে তার কাছ থেকে ফোন পেলাম। ফোনটি পেয়ে আমি শিহরিত হয়ে গেলাম। শিওরি সান ফোন করেছে। এত আবেগ আর খুশিতে আগে কখনো ভাসিনি। ও যখন ফোন দেয়, তখন আমি কিছুটা লাল হয়ে যাই। ক্ষণিকের জন্য হলেও স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে যায়। ক্ষণিকের স্তব্ধতা কেটে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসি। ফোনের ওপাশ থেকে মোশি মোশি শুনে হাই বলতেই একটি গলায় জোরালো ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন: 'গেনকি দেছ কা?' (গেনকি দেছ কা জাপানি শব্দ। এর অর্থ তুমি কেমন আছ?) আমার খুব স্বাভাবিক সহজ-সরল উত্তর 'হাই'। শিওর সানের প্রতি আমার কিছুটা রাগ থাকলেও সবকিছু যেন সাগরের অথই জলে ভেসে যায়। মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেল। আমার মনে হয়েছিল যে, ওইদিন হিরোশিমার আকাশে একটি দ্যুতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সাদা-নীল আকাশে

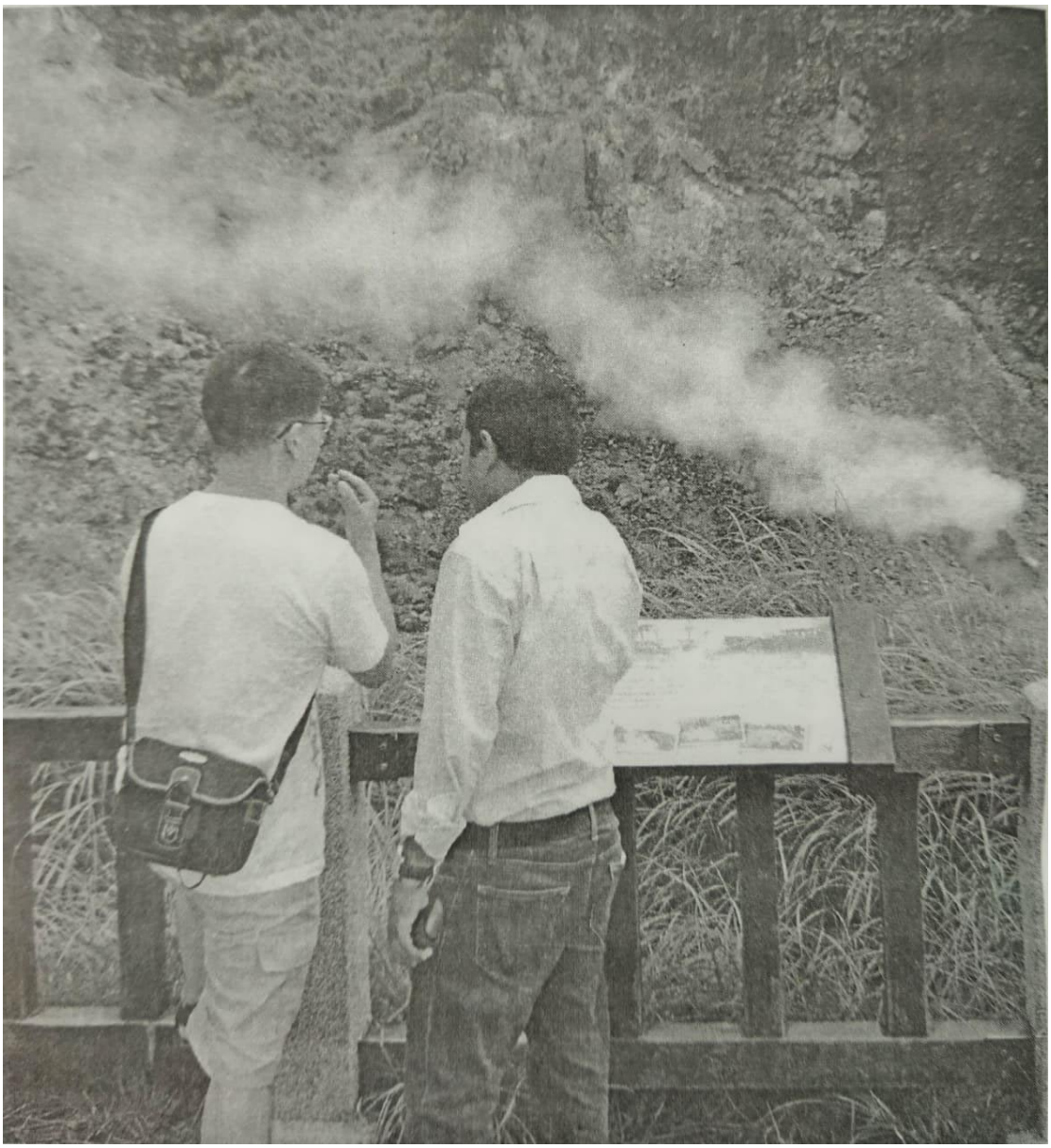

তাইওয়ানের রাজধানী তাইপের জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সামনে লেখক

কোথাও কিছু নেই। ধু-ধু শুভ্র আকাশে তাকিয়ে আমার মনের ভেতরটা শুধু প্রসারিত হয়ে গেল। আমার এই দৃষ্টিসীমানার কূল ঘেঁষে হঠাৎ একটি পাখি চলে এলো। পাখিটি আমার মনের কথা বুঝতে না পারলেও আমার হৃদয়ের পাখির সঙ্গে অনেক কথা হয়ে গেল। দূরের হলুদ প্রজাপতিটির এই ডাল থেকে সেই ডালে উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে আমি বুঝতে পারলাম শিওরি আজ আমাকে কফি খাওয়ার জন্য দাওয়াত করছে।

শিওরি আমাকে বলল: চলো, আজ সন্ধ্যায় কফি খাই। আমাদের খুবই পরিচিত জায়গা ইউমি টাউনের উলটোপাশের ক্যাফেতে গিয়ে আমি সময়মতো হাজির। শিওরি একটা সাইকেল চালিয়ে লম্বা কালো মোজা পায়ে হিল আর গায়ে একটা

ফ্রক। পেছনে একটা ছোট ব্যাগ। ব্যাগের কোনায় ছোট দুটি পুতুলের জোড়া। চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক। উঁচু চেয়ারে দুজন বসলাম। কফির অর্ডার দিলাম। আমরা দুজন মন খুলে ইংরেজি-জাপানি ভাষায় অনেক কথা বললাম। জাপানি মেয়েদের পালস বুঝে কথা বলা অনেক কঠিন কাজ। আমি ভেতরে ভেতরে অনেক ঘেমে গিয়েছিলাম। শিওরি সানের উচ্চতা আমার সমান। ওর গায়ের রং জাপানিদের মতো অতটা উজ্জ্বল নয়। সে অনেকটাই এশিয়ান মেয়েদের মতো ধূসর বর্ণের। আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু নাকি অন্য কিছু-এগুলো আমাকে ভাবায় না। আমি কথা বলে যাচ্ছি। ভালোই লাগছে। ইয়াং মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে আমার সব সময়ই একটা জড়তা কাজ করে। আমতা আমতা কণ্ঠে জড়োসড়ো হয়ে জীবনে অনেকবার অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, অনেকবার বকাও খেয়েছি। কিন্তু আজকের বিষয়টা ভিন্ন। কফি খাওয়ার ফাঁকে দূরের অখণ্ড আকাশের বিশালতার মতোই আমার মনটা আজ ভীষণ বড়। ভুল হলেও জাপানি ভাষায় কথা বলে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, শিওরি সানের ইংরেজি শেখার প্রতি একটা বিরাট ঝোঁক ছিল। আমার জাপানি ভাষায় কথাবার্তা যেখানে আটকে গিয়েছিল, সেখানে আমি ইংরেজি ব্যবহার করেছিলাম। আমি ইংরেজিতে খুব একটা ভালো না হলেও ঢাকা কলেজের 'গ' সেকশনের ইংরেজি ম্যাডামকে আমি ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছিলাম-তাঁর স্বামীর পেশা কী? অতগুলো মেধাবীর মাঝে আমার এই প্রশ্ন করা সহজ ছিল না। আমি বারবার ঘেমে গিয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। এই প্রশ্নের পর ম্যাডাম আমার ইংরেজির অনেক প্রশংসা করেছিলেন। সেই থেকে ইংরেজিতে কথা বলতে আমার মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা কাজ করত। বাংলা ভাষার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আছে। কিন্তু তারপরও ইংরেজিতে কথা বললে আমার মধ্যে এক ধরনের স্মার্টনেস ও আত্মতৃপ্তি কাজ করে।

কফি চলে এলো। লম্বা দুটো গ্লাসে দুজনের জন্য কফি। সঙ্গে আইস এবং দুটো পাইপ। ঠান্ডা কফি খাওয়ার অভ্যাস আমার খুব একটা ছিল না। তবুও ভাবখানা এমন নিলাম যে, এরকম ঠান্ডা কফি খেয়ে আমি অভ্যস্ত। প্লাস্টিকের পাইপ কফি গ্লাসের উপরে কভারের ফাঁকে ঢোকানো আছে। টানলেই হয়। কফি এসে গেছে অথচ শিওরি সান বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কালচার, মেয়েদের গহনা, শাড়ি পরা, কপালের টিপ, হাতে চুড়ি নিয়ে নানারকম প্রশ্ন। এগুলো নিয়ে আমার আলোচনা করতে মোটেও ভালো লাগছিল না। আমি বরং তাকিয়ে ছিলাম শিওরি সানের দুটো ঠোঁটের লিপস্টিকের দিকে। আমার আগ্রহ ছিল কীভাবে সে এই পাইপ দিয়ে ঠান্ডা কফি টেনে খাবে। নিশ্চয়ই লিপস্টিকের অবস্থা খারাপ হবে। জাপানি মেয়েরা পৃথিবীর নামিদামি ব্র্যান্ডের কসমেটিকস ব্যবহার করে। কসমেটিকস আর সাজুগুজুর পেছনে ওরা অনেক টাকা ব্যয় করে। এমনিতেই ওরা এত সুষম খাবার খায় ও নিয়মের মধ্যে চলে যে, ৪০ বছরের একজন নারীকেও নির্দ্বিধায় ২০ বছরের তরুণী বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। আর লিপস্টিক একটি কমন ব্যাপার। স্কুলের ছোট ছোট মেয়ে থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধা সবাই লিপস্টিক ব্যবহার করে। সম্ভবত লিপস্টিক ওদের অহংকার। খুব যত্ন করে ওরা এটা ঠোঁটে লাগায়। আমি

কয়েকবার পাইপ দিয়ে কফি খাওয়া শুরু করলাম। শিওরি তখনও কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। সে নতুন নতুন তথ্য নেওয়ার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। তার নিশ্বাসের ঢেউ আমার নাকে এসে থামল। আমি বারবার তার কারুকার্যখচিত ভ্রু ও লম্বা লম্বা দাঁতের অবয়ব হাসি দেখতে লাগলাম। এগুলো দেখার মধ্যে এক ধরনের নেশা লেগে গেল। ওর উড়ন্ত-বাড়ন্ত চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে বারবার মুখটিকে ঢেকে দিচ্ছিল। সে এত সুন্দর করে মেকাপ নিয়েছে যে, বাম ঠোঁটের উপরের তিলটি সাদা অবয়বের মাঝে রিক্ত-শূন্য হয়ে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। এরকম একটি মৌ মৌ গন্ধে পুরো রুমটিকে যেন ভিন্ন একটা পরিবেশে দাঁড় করিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, শিওরি সানের কফি খাওয়ার নেশা আজ নেই। কথা আর কথা। এরই মাঝে হঠাৎ সে পাইপ দিয়ে একটু কফি টেনে খেল। লিপস্টিকের কোনো পরিবর্তন হলো না। সে খুবই পারদর্শী নিজের সৌন্দর্য ঠিক রাখার জন্য। তার কফি খাওয়ার মাঝে একটা আর্ট আছে। আর্টটি আমাকে ভীষণ আনন্দ দিল। ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট পড়া একটি মেয়ের এত সাবধানতা নিজের মেকাপের প্রতি, যা দেখে আমি বিহ্বল।

এভাবেই সময়টা পার হচ্ছিল। হঠাৎ কফির একফোঁটা আমার কাপড়ে এসে পড়ল। আমার সঙ্গে কোনো রুমাল ছিল না। আমি একটু বোকা হয়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখি শিওরি সান তার ব্যাগ থেকে এক টুকরো গন্ধ মাখানো টিস্যু পেপার দিয়ে আমার শার্টের হাতা মুছে দিচ্ছে। সাধারণত জাপানি মেয়েরা অনেক নরম মনের হয়। তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ, নমনীয়তা আর মাতৃত্বের ছাপ পাওয়া যায়। জাপান এত উন্নত দেশ হলেও সেখানে মেয়েরা ততটা স্বাধীন নয়। ইউনিভার্সিটি, কলকারখানা, মিল-ফ্যাক্টরি, পোস্ট অফিস, সরকারি প্রশাসনিক লেভেলে-প্রতিটি পর্যায়ে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী থাকেন একটি ছেলে। যেমন ধরুন, একটি পোস্ট অফিসের প্রধান যিনি তিনি একজন ছেলে আর সামনের ডেস্কে যারা কাজ করেন তারা সাধারণত মেয়ে। হিরোশিমা গিনকোর (ব্যাংক) কথাই যদি বলি, পেছনে কম্পিউটার নিয়ে যিনি বসে আছেন তিনি একজন ছেলে আর সামনের ডেস্কগুলোতে যারা আছেন তারা মেয়ে। এত বড় হিরোশিমা ইউনিভার্সিটিতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন নারী প্রফেসর। এই বাস্তবতাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার কফি খাওয়া শেষ হলো।

শিওরি সান অনেকটা সময় পার করল। বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগল শুধু এক গ্লাস কফি খাওয়াতেই। কফি খাওয়া শেষ করে আমরা বিল পরিশোধ করে বাইরে এলাম। ততক্ষণে চারপাশের কোলাহল অনেকটা থেমে গেছে। কফির সেই রেস্টুরেন্ট থেকে শিওরি সানের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ইউমি টাউনের সামনে এলাম। আমি থাকি ঘাগারায়, সে থাকে সাইজোতে। দুজনের পথ দুদিকে। মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে রাস্তা পার হয়ে পুলিশ বক্সের সামনে দিয়ে ফুটপাত ধরে সোজা হাঁটছি। পূর্ণিমার সে রাতটিকে কেন যেন আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে। চাঁদের আলো যখন গায়ে পড়ে তখন নিজের ছায়াটিকে শিওরি মনে হতো। খুব

দূরে থেকেও কাছাকাছি হেঁটে দুজনে বাসায় ফিরছি। আমার মনের গুনগুন গান কাগামিয়ামা পাহাড় পেরিয়ে হয়তো সাইজোতে গিয়ে পড়েছিল। মৃদু হাওয়া আর নানারকম এলোমেলো চিন্তায় সেদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি বাসায় ফিরে আসি। আমি হাসি আর কল্পনায় হারিয়ে যাই। সেইদিনের সেই রাত আমাকে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। ভয় লাগলেও আমি জ্যোৎস্নার আলোকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম। আলোই ছিল আমার ওই রাতের সঙ্গী। আলোর সঙ্গে ভালোবাসা। হঠাৎ সুবহে সাদেক হলে আমার ঘোর কেটে যায়। আমি সজাগ হয়ে দেখি পাখির ডাক আর প্রজাপতির উড়ে চলা। আমার মনের ভেতর একটি মেঠো পথ ও সমুদ্রসৈকতের বালির রাস্তা আছে যা দিগন্তছোঁয়া। এই মেঠো পথ ও দিগন্তছোঁয়া আকাশ আর সমুদ্রসৈকত দিয়ে কে যেন হেঁটে বেড়ায়। তাকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারি না। আমি বুঝি আবার আমি বুঝি না। সত্যি-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, আলো-আঁধারির এই ঘোর আমার কাটে না। আমি দিব্যি সাইজো শহরে হেঁটে বেড়াই; কিন্তু আমার ভেতরের সেই পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা কেউ বোঝে না। আমি চাই আমার নিজস্ব জগৎটাকে এভাবে আমি আগলে রাখতে। বাহির এবং ভেতরের এই অজানা রহস্য চলছে তো চলছেই। একে জানার মতো ধৈর্য বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার হয় না। অনেক কিছুই আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, আবার অনেক কিছুই কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমার কাছে প্রজাপতির ছোট ডানাটি এক সময় অনেক বড় মনে হয়। কিন্তু আবার হিরোশিমায় বম্বডোমও আমার কাছে কিছুই মনে হয় না। চিন্তার এই ব্যাপকতা আমাকে ক্লান্ত করে। আবার আমি নতুন উদ্যমে কাজ করি। মনুষ্য চরিত্রের এই বিশেষ জটিলতা কোথায় শেষ? কোথায় তার প্রস্থান? ভোরের আলো চোখে লাগতেই চোখ কচলাতে কচলাতে দেখি আমি শুয়ে আছি টিচার্স ডরমিটোরির চার তলার সেই ৪০২নং কক্ষে।

কাগামিয়ামা পার্ক

পুলিশ বক্স থেকে সোজা সাইজো রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সুন্দর। ধীরে ধীরে রাস্তাটি উপরে উঠতে উঠতে আবার এক সময় স্লোপ হয়ে নিচে নেমে যায়। কাগামিয়ামা পার্কে আমার বহুবার যেতে হয়েছে। সোসাইটির সংগঠনের কাজে অথবা নিজের প্রয়োজনে। কখনো কখনো একা একা গিয়ে ঘুরে আসতাম। জাপানে একা একা থাকার যন্ত্রণা অনেক।নিজেকে হালকা করতে তখন অনেকেই এই কাগামিয়ামা পার্কে আসত। প্রকৃতি এত সুন্দর যে, কোষের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকা দুঃখ আর বেদনাগুলো নিমেষেই পার্কের বাতাসে বিলীন হয়ে যেত। পার্কের নীরবতা আমাকে খুব টানত। পার্কে আমার আসা-যাওয়া সেই শুরু থেকেই। প্রথম প্রথম যেতে হতো বাঙালি কমিউনিটির নানা কাজে সহযোগিতার জন্য।

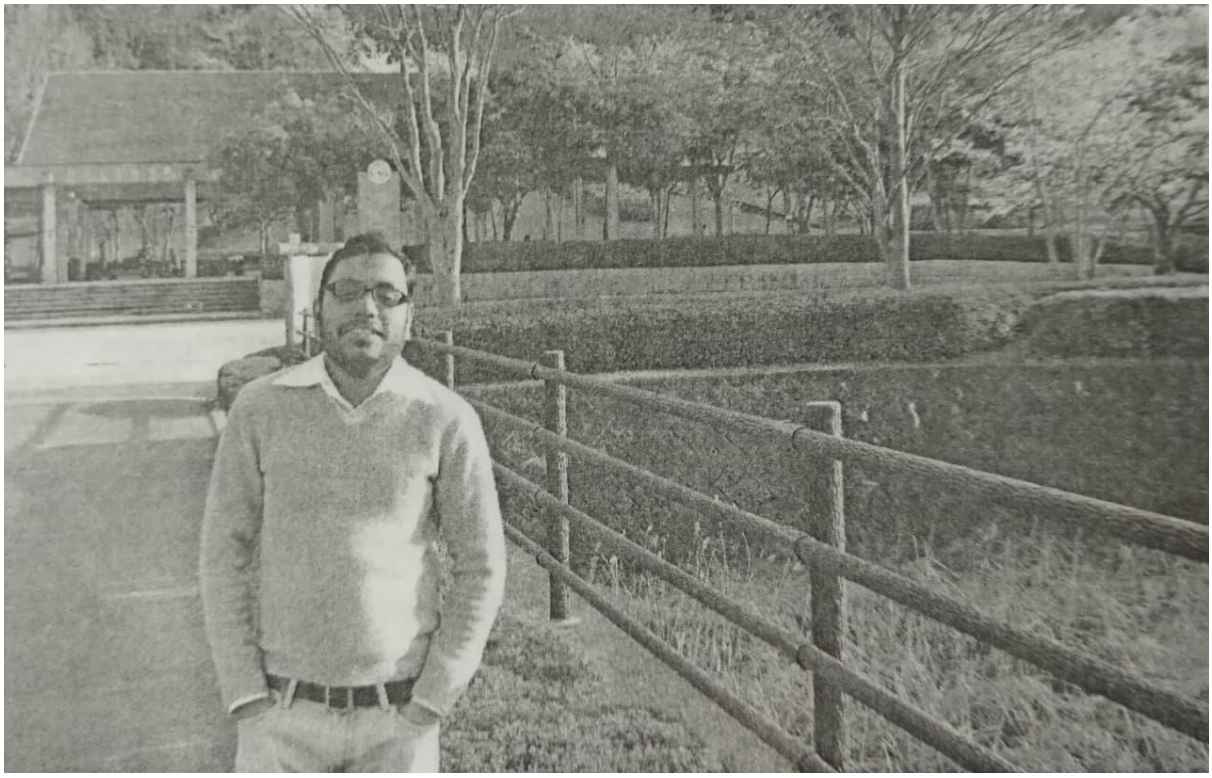

জাপানের হিরোশিমার কাগামিয়ামা পার্কে লেখক

আবহাওয়া খুব ভালো। চারপাশে চেরি ফুল ফুটেছে। প্রকৃতি নতুন সাজে সেজেছে। আজ আমরা বাঙালি কমিউনিটির সবাই মিলে কাগামিয়ামা পার্কে যাই। আমার ছোট মোটরসাইকেলটা নিয়ে দুপুরের পরপরই চলে গেলাম। মোটরসাইকেল পার্ক করে ব্রিজের পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। ব্রিজের এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ নির্মল পানি দেখছিলাম। মৃদু হাওয়া দূর থেকে এসে গায়ে লাগছিল। দূরের ওই মাঠের ওপারে জাপানি বাড়িটিকে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর মনে হচ্ছিল। ধুধু মাঠ আর একপাশে কাগামিয়ামা পার্কের চেরি ফুল। পুরো কাগামিয়ামা মনে হলো যেন সাদা শাড়িতে সেজেছে। সময় যত গড়াচ্ছে, লোকজন ততই আসছে। আমরা হেঁটে গিয়ে পার্কের মাঝামাঝি একটি জায়গায় পাটি বিছালাম। তার ওপর লজেন্স, কাজুবাদাম আর সফট ড্রিংকস রাখলাম। আমাদের মাঝে খাবারের এই সামান্য জিনিসগুলো কখনোই আমাদেরকে আকৃষ্ট করেনি। প্রকৃতির এত সুন্দর রূপ আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। প্রকৃতির সবুজের সমারোহ বহুবার দেখেছি; কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। অনেকে পরিবারসহ এখানে চলে এসেছে। অনেকে আবার ইন্ডাস্ট্রির সব কর্মী কিংবা ল্যাবের সব সদস্যকে নিয়ে গোল করে আড্ডা দিচ্ছে। চেরি ফুল জাপানিদের প্রকৃতির একটি ঐতিহ্য। এই ফুল বড়জোর এক সপ্তাহ থাকে, তারপর ঝরে পড়ে। আমি কাজুবাদামের প্যাকেটটি খুলে দু-একটা বাদাম খাওয়ার চেষ্টা করলাম। আর চারপাশের মানুষের কোলাহল দেখলাম। ঠিক যেমন বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখের মতো। আমি একটি গাছের নিচে গিয়ে চেরি ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। ফুলটির কোনো ঘ্রাণ নেই অথচ দেখতে পরির

মতো। আমরা এবার উঠে পার্কের ঠিক মাঝখানে গেলাম। ওখানে একটি উঁচু পাহাড় আছে। কেউ কেউ মাঝেমধ্যে সেখানে হাইকিং করে। আমরা ওঠার চেষ্টা করলাম। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠলাম। পাহাড়টিতে ওঠা অনেক কষ্টকর। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ছুঁইছুঁই। পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো সাইজো শহরের বিল্ডিং, দোকানপাট আর বাড়িঘরকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে সাইজোর ল্যান্ডস্কেপ আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সেই ছোট্ট সাইজো শহর যেখানে আমরা বাঙালিসহ অনেক বিদেশি থাকি। চারপাশে পাহাড়। মাঝের কিছু জায়গা সমতল ভূমি নিয়ে সাইজো শহর। কোথাও কোনো হর্ন নেই, বাঁশির শব্দ নেই। শুধু পাখির কোলাহল, দূরের বাড়ি-ঘর, পাহাড় আর চারপাশের সাদা সাদা চেরি ফুল। পাহাড়ের চূড়া থেকে মনে হচ্ছিল, এই সাইজো শহর চেরি ফুলের মাঝে দিগন্তের মতো একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল।
এক সময় আমাকে হিরোশিমায় বাঙালি কমিউনিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমি অনেকের তুলনায় জুনিয়র ছিলাম বিধায় অনেক কাজ আমাকে একা একা করতে হয়েছে। কাউকে অর্ডার দিয়ে কিছু একটা করাব-ইতস্তত বোধ করতাম। আমার ছোট মোটরবাইকটি নিয়ে বহুদিন, বহু মানুষের বাসায় নানারকম ছোটখাটো কাজে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। অনেক মানুষের তিরস্কারও আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। এগুলো কি নিজের জন্য? না। এমনকি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে হলেও বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে হয়েছে। এগুলো করে আনন্দ পেতাম। নিজেকে ঝালাই করে নিতাম। মানবসেবা কেমন কিংবা নানা মানুষের নানান রকম প্রেশার নেওয়ার ক্ষমতা কতটুক তা বুঝতে চাইতাম। অনেকের কাছ থেকে আবার অনেক ভালোবাসাও পেয়েছি। আমি শ্রদ্ধাভরে হিরোশিমাবাসীর সেই সব অগ্রজ ও অনুজ ভাই-বোনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মানুষের কাছ থেকে সব সময় রিটার্ন চাইতে নেই। তাহলে শুধু কষ্ট বাড়ে। বরং কারো জন্য কিছু করলে নিঃস্বার্থভাবে করা উচিত। তাহলে আফসোস আর কষ্ট থাকে না। ভালো থাকা যায়। নির্দ্বিধায় হেসে-খেলে জীবন পার করা যায়। কেননা মানবজাতি বৈচিত্র্যময় ও রহস্যে ভরপুর। তাদেরকে চেনা অনেক কঠিন। সম্ভবত মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা সামান্য স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে দীর্ঘদিনের উপকারের কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উপকারীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অতীতকে ভুলে যায়। চুরমার করে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নষ্ট করে। সাময়িক সুবিধার জন্য অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি অনেক শিক্ষিত লোক ন্যায়-অন্যায়কে পৃথক করতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আমার আজও মনে হয়, সত্যিই কি তারা কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক তা বোঝে না? রহস্যময় তাদের আচরণ! এ ধরনের পরিস্থিতির মাঝে কখনো কখনো আমাকে পার হতে হয়েছে। আমি নীরবে সব সহ্য করে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করেছি।

অনুমোচি

ওইসময়টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের জাহাঙ্গীর ভাই ও ভাবি আমাদের বাসায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। একদিন আমরা ঠিক করলাম অনুমোচি যাব। অনুমোচির দৃশ্যটি একটু অন্যরকম। একটি ছোট লঞ্চে চেপে আমরা বসলাম। ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি আমাদের অনুমেচি দেখাতে লাগল। দুপাশের পাথর ঘেঁষে জাপানি বাড়িগুলো এত সুন্দর ও পরিপাটি ছিল যে, মনে হচ্ছিল আলতো করে একটু আদর করে দিয়ে আসি। আগে কখনো এভাবে সমুদ্র থেকে উঠে আসা এরকম বে দেখিনি। পানি স্বচ্ছ কিন্তু একটু নীলাভ ছিল। দুপাশে এত জনবসতি অথচ পানিতে কোনো ময়লা নেই। জাপানিরা এত ইউনিক কেন? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি-উত্তর পাই না।

বউয়ের নতুন জামার গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে। বয়স যা-ই হোক না কেন, আমি একটু শিশুসুলভ হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকবার ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরাই পানিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সানি একটি বড় কালো গ্লাস পরেছে। আমার পাশে বসা সানিকে আজ অন্যরকম লাগছে। শ্যাম্পু করা এলো চুল, বড় গ্লাস কেমন যেন লাগছিল তাকে। আজ তার ড্রেসটিও অন্যরকম। আমি কখনো সানির পাশে আগে এভাবে বসিনি। জাপানের এই সৌন্দর্য আমি উপভোগ করছি। কিন্তু চারপাশে এত টেম্পল আর এত পাথর আগে কখনো দেখিনি। নৌকা থেকে নেমে আমরা আবার গাড়িতে। জাহাঙ্গীর ভাই গাড়ি খুব ভালো চালান। আঁকাবাঁকা বিভিন্ন লেন অতিক্রম করে আমরা অনুমোচি সেতু এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে চললাম। এই রোড সোজা ইয়েমে প্রিফেকচারের দিকে চলে গেছে। সেতুর মাঝে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল যে আমরা বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যাচ্ছি। প্রকৃতির এমন অপরূপ দৃশ্য আর পাশে বসা এত কাছের মানুষের সঙ্গে জার্নি করা কার-না ভালো লাগে? গাড়ি শোঁ শোঁ করে ১০০/১৫০ কি.মি. চলে এলো। আসার পথে আমরা বেশ কয়েকটি সেতু পার হয়েছি। জাপানের একটি দ্বীপের সঙ্গে আরেকটি দ্বীপের সংযোগ করিয়েছে এসব সেতু। সেতুগুলো দেখতে অনেকটা ঝুলন্ত মনে হয়। রাতে রাস্তার দুপাশের লাইটগুলো থেকে বিকীর্ণ মায়াবী আলো আমাদের উত্তাল করত। বিশেষ করে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হাজারো ল্যাম্পপোস্ট পার হওয়ার সময় একটা টানটান উত্তেজনা কাজ করত।

একসময় ক্লান্তি আর অবসাদ আমাদেরকে চেপে ধরল। আমরা গাড়ি এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নামিয়ে নিচে নিয়ে এলাম। পাশে ছোট একটি টেম্পল দেখলাম। টেম্পলের পাশে পানির একটি পাইপ থেকে আমরা পানি খেলাম। চারপাশে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো। নানারকম ফুল আর উদ্ভিদে গার্ডেনটি ভরা। দু-চারজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে এখানে হাঁটতে দেখলাম। তারা আমাদেরকে খুব সম্মান করল। আমরা কোথাও যেতে চাইলে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে আমাদেরকে জায়গা দিচ্ছে। জাপানি বৃদ্ধরা ইয়াংদের অনেক সম্মান করে। অনেক বৃদ্ধাশ্রমে দেখেছি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কতটা অসহায়ভাবে জীবনযাপন করে। আমরা পার্কটি দেখে আবার

গাড়িতে চড়ে বসলাম। ইয়েমে প্রিফেকচারের খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে আবার আমরা হিরোশিমায় পৌঁছলাম।

জাপানের ঐতিহ্যবাহী কিমিনো পরিহিত অবস্থায় লেখক

বাসায় এলেও হিরোশিমা আর অনুমোচির দৃশ্য আমার চোখে লেগেই আছে। বাসায় এসে ভাবি, আমি ছোট্ট একজন মানুষ। বাংলাদেশের সেই অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ এখানে। সময় এবং পরিবেশ মানুষকে কী করে! আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। নিজেকে যেন চিনি না। আগের আমি আর বর্তমান আমি কি এক? ভয় লাগলেও আমার এক ধরনের সুখ লাগে। আমার মনে পড়ছিল অনুমোচির সেই পার্কের দূর্বা ঘাসের কথা। এমন ঘাসের ওপর আগে কখনো এভাবে পা ফেলিনি। ঘাস আর মাটির ছোঁয়া আমাকে আপ্লুত করে। এই মাঝরাতেও আমার মনে হতো দূর্বা ঘাস আর মাটির সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক

আছে। আমি ভুলে যেতে চাইলেও ওগুলোর অতল গভীরতা থেকে সুখ নামক পাখিটি বারবার উড়ে আসে।

হিরোশিমা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার (এইচআইসিসি)

ছোটবেলায় মা আমাকে গ্রামের মক্তবে হুজুরের কাছে পাঠাতেন। কায়দা, সিপারা শেষ করে আমি কোরআন শরিফের সবক নিয়েছিলাম। তারপর থেকে বেশ কয়েকবার কোরআন শরিফ খতমও দিয়েছি। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় ওই যে নামাজ ধরেছিলাম, এখনো আলহামদুলিল্লাহ নিয়মিত নামাজ পড়ি। নামাজ পড়তে পড়তে বাম পায়ের গোড়ালিতে শক্ত কালো চাকতির মতো দাগ পড়ে গেছে। নামাজ পড়তে গিয়ে এটি হয়েছে। এই কালো শক্ত চাকতিকে আমি খুব ভালোবাসি। কারণ, এই কালো চাকতি আমাকে যেকোনো অন্যায় হতে বিরত রাখে। আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, আমি মুসলমান। আমার একটি আদর্শ আছে। আমি ইচ্ছে করলেই যা খুশি তা করতে পারি না। আমি ইসলামিক মূল্যবোধ ধারণকারী এক টগবগে তরুণ। যেটাই মাথায় ঢুকত, তা মন দিয়ে করতাম। সাইজো শহরে তখন বাংলাদেশি, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান ও মিশরীয় কমিউনিটি ছিল। একটি বাসা ভাড়া নিয়ে তাতে শুক্রবারের জুমা ও অন্যান্য দিনের নামাজ পড়তাম। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা ক্যাম্পাসের 'ডায়গাকু কাইকানে' অনেক নামাজ পড়েছি। এভাবেই চলছিল আমাদের মুসলিম কমিউনিটির কাজ। আমরা মাসে মাসে চাঁদা দিতাম। এক সময় এই ফান্ড অনেক বড় আকার ধারণ করল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সিনিয়ররা আগেই ৪-৫ শতাংশ জমি মসজিদ করার জন্য হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইজো আসার পথে ডানদিকে শিতামি নামক এলাকায় কিনে রেখেছিল। আমরা মসজিদ করার প্ল্যান করেছিলাম।

তো আমাদের এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বাছেম (মিশরীয়) ও রাফি (শ্রীলঙ্কান)-কে আমাদের কমিউনিটিতে জায়গা করে দিলাম। কারণ, তাদের জাপানি নাগরিকত্ব আছে ও তারা ভালো জাপানি বলতে পারে। মূলত তাদের একজন হিরোশিমা শহরে ও আরেকজন শহর থেকেও একটু দূরে থাকত। তো আমরা মাঝে মাঝে শিতামি নামক ওই জায়গায় যেতাম এবং গাছপালা পরিষ্কার করতাম। ধীরে ধীরে আমরা মনস্থির করলাম যে, ওখানে মসজিদ নির্মাণ করব। কিন্তু সাইজো সিটি অফিস থেকে আমাদের বলা হলো যে, যেহেতু এটি একটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকা সেহেতু মসজিদ (বোনকা সেন্টার) নির্মাণের জায়গার চারপাশের শ'খানেক প্রতিবেশীর সিগনেচার অর্থাৎ হ্যাঁ-সূচক অনুমতি লাগবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা বহু চেষ্টা করেও সেই সব জাপানির হ্যাঁ-সূচক অনুমতি নিতে ব্যর্থ হই। ফল যা হওয়ার তাই হলো। আমরা সেখানে মসজিদ করার অনুমতি পেলাম না। পরে সিদ্ধান্ত হলো, জায়গাটি বিক্রি করে অন্য জায়গায় নতুন করে মসজিদ করা হবে। নতুন করে কমিটি করা হলো।

আমি আগের কমিটিতে প্রচার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলাম। আমি কখনোই পদ-পদবি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। সব সময় চেষ্টা করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে। তো নতুন কমিটিতে আমাকে সভাপতি ও মিশরের আবদেল মোমেনকে সাধারণ সম্পাদক করা হলো। আমরা ওই জমি বিক্রি করে নতুন জমি ক্রয় করার জন্য জায়গা খুঁজছি। অবশেষে আমরা আগের জায়গাটি বিক্রি করে দিই। আমাদের কাছে ৫০০-৬০০ মান জাপানি ইয়েন আছে যা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় ৪০-৫০ লাখ টাকা। আমরা বিভিন্ন জায়গা দেখি; কিন্তু মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছি না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা হিরোশিমার অনলাইন পারচেজ মার্কেট থেকে দেখলাম যে, এক লোক ব্যাংকের ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে পারেনি বিধায় তার ৫তলা বাড়ি নিলামে বিক্রির জন্য উঠছে। আমরা সেখানে বিট করি এবং জিতে যাই। আমাদের তিন মাসের সময় দেওয়া হয়। বাড়িটির দাম আনুমানিক ৪,০০০ মান জাপানি ইয়েনের উপরে যা বাংলাদেশের টাকায় ৩ কোটি টাকার চেয়ে কিছু বেশি। আমরা টাকা কালেকশনের জন্য গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পুরো জাপানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ি। প্রতি শুক্রবার টোকিও, সায়তামা, ফুকুওকা, ইয়েমেগুচি, গিফু, আইচি, সিমানে প্রভৃতি প্রিফেকচারে যাই। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সব মুসলিম ভাই-বোনের সহযোগিতায় তিন মাসের মধ্যে বাড়িটির মূল্য পরিশোধ করি। আমরা বাঙালি, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান ও মিশরীয় কমিউনিটি আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের কমিউনিটির লোকদের থেকেও টাকা উঠাই। আমার মনে আছে, ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিটি সবার থেকে বেশি টাকা ডোনেট করেছিল।

আমার যে ছোট্ট অভিজ্ঞতা তাতে মনে হয়, জাতি হিসেবে আমরা বিচ্ছিন্ন ও হিংসুটে। কেননা, যখনই মসজিদ নির্মাণের টাকা কিংবা অন্য যেকোনো কাজ করতে বলা হতো, তখনই ইন্দোনেশিয়ান বা মালয়েশিয়ানরা কাজ শেষ করে ফেলত। আর আমরা বাঙালিরা কাজে ঠেলাঠেলি করতাম কিংবা কেউ আসত বা কেউ আসত না। ইন্দোনেশিয়ানরা টাকা এত বেশি উঠিয়ে ছিল যে, তাঁদের কমিউনিটির নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পরও প্রায় ৩০০ মান জাপানি ইয়েন (২৩ লাখ টাকা প্রায়) বেশি হয়েছিল যা দিয়ে আমরা একটি প্রাইভেট কার ক্রয় করেছিলাম। সেই কার দিয়ে অনেক স্টুডেন্ট নিয়মিত ক্যাম্পাস থেকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত।

ভবন ক্রয়ের পর আমরা কমিটির লোকজন ওই বাসার দোতলায় যাই। লোকটির শ-খানেক ব্লেজার, বিলাতি কুকুর পালনের স্থান আর তার বিলাসী জীবনের নানা খণ্ডচিত্র দেখতে পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং সময়মতো তা পরিশোধ করতে পারেননি বিধায় তাকে এতবড় বাড়ি জায়গাসহ হারাতে হলো। শুনেছি, উনি এখন একটি ট্যাক্সি ক্যাব চালান। পাশেই অন্য এলাকায় থাকেন এবং ভুলেও তিনি এই এলাকায় আর আসেন না। অনেক চাপা ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে হয়তো তিনি কোনোরকম বেঁচে আছেন।

মে ৪, ২০১২ সালে মসজিদ উদ্বোধনের তারিখ ঠিক করা হলো। হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর উয়ে সিন ইচি, আমার ঘনিষ্ঠ কাজিযুশি সামা, জাপানি মুসলিম মায়েনো শেনসে, এমএসএজে (মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব জাপান) সাধারণ সম্পাদক ব্রাদার ফাডিসহ অনেক গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। তো সেই অনুষ্ঠানে আমার বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বক্তৃতা শেষে আমি আমার নিজের লেখা একটি কবিতা সেদিন মসজিদকে উপহার দিয়েছিলাম। কবিতাটি লাইব্রেরিতে আজও সংরক্ষিত আছে:

স্বপ্ন এবং সংশয়

গত কয়েকদিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

এইচআইসিসি নিয়ে অনেক চিন্তা করি, সেজন্য কি না, কে জানে।
অনেক কষ্ট করে আমরা সবাই ডোনেশন দিয়ে

মসজিদটা কিনলাম কত বছর কত কালের স্বপ্ন বিছিয়ে।

একটি সুস্থ, সুন্দর, শান্তিপ্রিয় ইসলামিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে।

জাপানিরা এমনিতেই অনেক ভালো

তাদের হয়তো কোনো ধর্ম নেই।

আমাদের মহান ধর্ম আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)' বাণীটি সব বিধর্মীর কানে কানে পৌঁছে দেওয়া।

সেই থেকে সবাই মিলে পড়াশোনার ফাঁকে ল্যাব, ক্লাস কিংবা থিসিস

লেখার গ্যাপে,

সময়, শ্রম ও অর্থ বিলিয়ে দিয়েছি

আল্লাহর টানে।

আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, চারদিকে সাজ সাজ রব

খুব ভালো লাগছে এগুলো ভেবে।

একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াস নিয়ে যাত্রা শুরু এই ইসলামিক সেন্টারের।

এই মসজিদের প্রতিটি ইট পাথরের সঙ্গে,

মিশে আছে সব মুসলমানের শ্রম ও ঘাম

এটি কারোর একার নয়- সবাই আমরা মালিক।

এই মসজিদ সুন্দর হোক, গড়ে উঠুক আপন মহিমায়

হোক সব ইসলাম ধর্মের চিন্তা-চেতনার

গবেষণার- দাওয়ার প্রাণকেন্দ্র।

আমিন।

[*এইচআইসিসি- হিরোশিমা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার]

রেনভেশনের পর মসজিদটি সত্যিই অনেক সুন্দর হয়েছিল। বিদেশের মাটিতে এরকম ইসলামি আবহ পরিবেশে নামাজ পড়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। নিচতলার পূর্ব পাশে রমজানের ইফতার ও সেহরি এবং তাবলিগ জামাতের রান্না করার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাশে আগে থেকেই একটি কর্পোরেট অফিস হিসেবে ভাড়া ছিল। দোতলা ও তিন তলা মুসলিম স্টুডেন্টদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। তারা তুলনামূলক কম খরচে এখানে থাকতে পারে। চতুর্থ তলা পুরুষ ও পঞ্চম তলায় মহিলারা নামাজ পড়েন। পঞ্চম তলার একপাশে একটি লাইব্রেরি আছে। এখানে কোরআন, হাদিস ও ইসলামিক অন্যান্য বই রাখা আছে। মূলত মসজিদকে আমরা এইচআইসিসি (হিরোশিমা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার) নাম দিয়েছি। এটার মূলত উদ্দেশ্য ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কালেমার আওয়াজ জাপানের সব অমুসলিম ভাই-বোনের কানে পৌঁছে দেওয়া।

আমি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু কীভাবে যে এত বড় দায়িত্ব পালন করেছিলাম, তা ভাবলে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। আমি মনে করি, আল্লাহর রহমত ও মানুষের ভালোবাসা থাকলে যেকোনো কঠিন কাজ সহজে করা সম্ভব। আমার সহযোদ্ধাদের অনেকের সঙ্গেই এখন আর যোগাযোগ নেই। তবুও মনে পড়ে মিশরের ব্রাদার আইমান, ব্রাদার মোমেন, ইন্দোনেশিয়ার ব্রাদার ইনডেন ও মালয়েশিয়ার ব্রাদার হেলমির কথা। তাদের নাম আমার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। একদিন আমি মরে যাব; কিন্তু আগামী প্রজন্ম হাজার বছর ধরে ওই মসজিদে নামাজ পড়তে থাকবে। এই বোনকা সেন্টারটি হোক দক্ষিণ জাপানে ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র।

মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে শেখে। শিখে নিজেকে পাকাপোক্ত করে। তো আমাদের মসজিদ হওয়ার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা নিয়মিত পড়তে শুরু করলাম। আমাদের নিজস্ব কোনো ইমাম নেই। আমাদের মধ্যে যে একটু ভালো ধর্মীয় জ্ঞান রাখে, তাকেই ইমাম বানিয়ে আমরা নামাজ পড়তাম। বিশেষ করে শুক্রবারের খুতবা ও ইমামতি করার জন্য আমরা নিজেদের কমিউনিটির বাছাইকৃত লোকদের মাঝে পালাক্রমে দায়িত্ব বণ্টন করে দিতাম। আমিও মাঝে মাঝে জুমার নামাজে খুতবা দিতাম। কদাচিৎ আমাকে ইমামতিও করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম ভয় পেলেও পরে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর স্টাডি করে খুতবা দিতাম। বাংলাদেশের মসজিদগুলোয় শুক্রবারে যে রকম আমেজ তৈরি হয়, অনেকটা সে রকম পরিবেশই তৈরি হতো। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ইংরেজিতে দিতে হতো এবং পরে খুতবাটা স্বাভাবিক নিয়মে আরবিতে দিতে হতো। বিভিন্ন দেশের এত ট্যালেন্ট মুখের সামনে কথা বলা সহজ ছিল না। বাংলাদেশের সরকারি পর্যায়ের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য হিরোশিমায় যেত, তারা থাকত।

ইসলামিক ভাবগাম্ভীর্যের সে সময়টাকে আমি খুব উপভোগ করতাম। শুক্রবারের নামাজ শেষে নিজেকে এত বেশি শুদ্ধ মনে হতো যে, আগামী এক সপ্তাহের কাজের প্রেরণা ওখান থেকেই পেতাম। আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার যে আত্মতৃপ্তি, সেটা যে উপলব্ধি করেছে সেই-ই জানে। শুক্রবার আমি মাঝেমধ্যে রোজা রাখতাম। অন্য যেকোনো দিনের চেয়ে ওইদিন ভালো রান্না করতাম। ভালো খেতাম। আনন্দ করে দিনটা পার করতাম। ধর্মীয় কোনো কোনো বিষয়ে এশিয়ান ও অ্যারাবিয়ানদের মাঝে কখনো কখনো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

জাপানের হিরোশিমায় মে ৪, ২০১২ সালে মসজিদ উদ্বোধনের সময় লেখক

মানুষের মন এবং গণতন্ত্র

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করি। মানুষের মন সত্যিই খুব অদ্‌ভুত! তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ইদানীং আমি নিজেকে নিয়ে বড্ড ভাবি। মানুষের বিভিন্ন কটুবাক্য ও হিংসা আমাকে খুব ভাবায়। হিরোশিমার মতো ছোট একটি শহরে যেখানে ৩০-৪০ জন বাঙালি থাকে, সেখানেও ভদ্রতার লেবাসে কেউ কেউ গণতন্ত্র চর্চাকে ব্যাহত করে। ছোট একটি কমিউনিটি, যেখানে ৪-৫ জন মিলেমিশে কাজ করে যেকোনো প্রোগামকে সফল করা যায়; সেখানে কেউ কেউ এমন আছেন যে, সারা জীবন ওই কমিউনিটির প্রধান হয়ে থাকতে চান। সবাইকে নানা প্রলোভনে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যেখানে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার কথা বলি সেখানে কীভাবে এরকম প্রতিযোগিতা থাকে? আমি এসব দেখে ভাবি, কী হবে এই জীবনে? এক ধরনের হতাশা আর গ্লানি আমাকে চেপে ধরে। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো আমি কিছুই না। আবার ভাবি, না, হয়তো আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করা অনেক কঠিন। 'একলা চলো রে'- এই নীতিতে আমি যথেষ্ট দৃঢ়। সমাজের ঝরেপড়া মানুষকে নিয়েও আমি ভাবি। স্কলারশিপ ছাড়াও অনেক ইয়াং বাংলাদেশ থেকে জাপানে ল্যাংগুয়েজ কোর্স বা অন্যান্য ছোটখাটো প্রোগ্রামে যান। জাপানে সারভাইভ করার জন্য তারা অনেক কষ্ট করেন। দিনে-রাতে পার্টটাইম জব করেন। অনেক সময় তারা বিভিন্ন প্রিফেকচারে মূল ধারার বাঙালি কমিউনিটির বাহিরে থাকেন। তাদেরকে অনেকে অবহেলা করেন। এমনই কিছু স্‌টুডেন্টকে আমি হিরোশিমার বাঙালি কমিউনিটির ভেতরে আনার চেষ্টা করেছি। কারণ, অসহায়দের প্রতি সব সময়ই আমার একটা টান কাজ করত। তারা আমার বাসায় আসত, খেত, আড্ডা দিত। তাদের সংস্পর্শ আমার ভালো লাগত।

মনুষ্য চরিত্র একটি বিশাল ক্ষেত্র। তাকে পরিমাপ করা কঠিন। কারণ, এটি সময়ে-অসময়ে বদলায়। বিশেষ করে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে মানুষের মনের অনেক মিল। শুধু সাময়িক কিছু স্বার্থ কিংবা সুযোগ-সুবিধার জন্য অনেক শিক্ষিত ও সম্মানিত লোক আছেন যারা হিরোশিমায় গিয়ে স্বৈরতন্ত্রীমনা অযোগ্য লোকের কাছে নিজের আনুগত্য প্রদর্শন করেন। মানব চরিত্র বেশ জটিল। আমরা প্রত্যেকেই যে সমাজে বসবাস করি সেখানে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে চাই। হয়তো অর্থ নয়, শক্তি দিয়ে। আর এই প্রভাবশালী হতে গিয়ে আমরা ব্যবহার করি অস্ত্র। আবার কেউ কেউ অস্ত্র নয়, ব্যবহার করে বেয়াদবরূপী কিছু তরুণ যুবককে।

আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। কোথাও ভুল হলে সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলতা করে সেটা সমাধান করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীকে আমার খুব পছন্দ। অহিংস আন্দোলন আমাকে খুব ভাবায়। কিন্তু আজকের এই সমাজে এই প্রিন্সিপাল কতটা যুগোপযোগী তা বলা দুষ্কর। তারপরও এই নীতিটি অনেক দিক দিয়ে সঠিক। দাগহীন সাদার বড় অভাব। এই জীবন বৈচিত্র্যময়। তাই নিজেকে আমরা এই রঙ্গমঞ্চে বিভিন্নভাবে নাচাই। কী সুন্দর পৃথিবী অথচ এলোমেলো চিন্তা আর অযাচিত হিংসা, আক্রোশ আমাদেরকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। একটা নীরব ব্যথা বুকে চেপে ধরে সবকিছু সহ্য করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি খুব ব্যথিত হয়েছি। তবুও সবার জন্য আমার শুভকামনা ও দোয়া রইল। তবে একটি জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি যে, ক্ষমতা কারো হাতে গেলে সে তা আর ছাড়তে রাজি নয়। সেটি ছোট্ট একটি কমিউনিটি থেকে শুরু করে সমাজের অনেক উঁচু পর্যায় পর্যন্ত। সেজন্যই হয়তো আজ আমাদের সমাজে এত হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি!

আবেগ ও বাস্তবতা

কেউ কেউ আমাকে বাহ্যিকভাবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিরস্কার করেছে। অনেক সময় হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়েছি। জীবনকে কখনো কখনো ছন্দহীন মনে হতো। তবে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা ভালো, সেটা অনেক সময় ভালো না হয়ে ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি, মহান রাব্বুল আলামিন যা করেন, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। সবর করা এবং আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করা আমাদের উচিত। যৌবনে আবেগ দিয়ে অনেক কিছুই রঙিন মনে হয়। তখন আমরা কল্পনার ডানায় ভর করে আকাশে উড়ে বেড়াই। এই দিগন্ত থেকে ওই দিগন্তে ঘুরে বেড়াই। ভার্চুয়াল জগতের রঙিন ও চাকচিক্য অনেক কিছুই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। আমরা আমাদের চিন্তার মার্জিনাল লাইন অতিক্রম করে সীমা লঙ্ঘন করি! যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে কালিমালিপ্ত করি! সেই কালিমা আমাদেরকে আরও একধাপ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ভালো চিন্তা ও কাজ সব সময় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেয়। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তৈরি করে। নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে ও নিজেকে ভালোবাসতে শেখায়।

আবেগকে কন্ট্রোল করা উচিত। কারণ, আবেগ আর বাস্তবতা দুটো ভিন্ন জিনিস। আমি ধৈর্য ধরে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। বয়সও বেড়ে চলেছে। ২০১৫ সালে জাপান থেকে দেশে এসেছি রিসার্চ পারপাসে। পারিবারিকভাবে দু-একটি মেয়েও দেখা হয়েছে। তখন বাংলাদেশে লাগাতার হরতাল চলছিল। অবশেষে মায়ের পছন্দে পারিবারিকভাবে আমি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রোজ শুক্রবার বিয়ে করি। আমার বউ সাইফুন নাহার সানি সদ্য পাস করা ফ১৮ ব্যাচের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। তখন সে ইন্টার্নি করছে। বিয়ে করে জাপানে চলে গেলাম। ইন্টার্নি শেষ করে সে জাপানে আসতে খুব আগ্রহী। বছর খানেক পর তাকে জাপানে নিয়ে এলাম। প্রথমদিকে খুব ভালো যাচ্ছিল। স্বপ্নের জাপানকে দেখে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কিন্তু ল্যাবে আমার দীর্ঘ সময় পার করার কারণে তাকে খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। বাসায় একা একা থাকতে সে খুব বোর ফিল করছিল। অনেক কষ্ট করেও ডাক্তারি পেশার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে কোনো জব দিতে পারিনি। কারণ, সে জাপানি ভাষা পারে না এবং জাপানিরা বিদেশি ডাক্তারদেরও অ্যালাউ করে না। আমি খুব বিপত্তির মধ্যে পড়েছিলাম। তাকে বিজি রাখার জন্য প্রথমে একটা পত্রিকার ডিস্ট্রিবিউটর সেন্টারে ও পরে নুডলস তৈরির কারখানায় চাকরি ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। অতিরিক্ত ঠান্ডা ও শূকরের মাংস না ধরার অজুহাতে কয়েক দিনের মধ্যেই নুডলস কারখানার চাকরিটি চলে যায়। অবশ্য সুজুকি সানের পত্রিকার চাকরিটি মোটামুটি আরামেই করছিল। ধীরে ধীরে জাপানের প্রতি তার অনাগ্রহ বাড়তে থাকে। তার রুমমেট বান্ধবী মিতু ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এফসিপিএসে চান্স পেয়েছে। ইমোতে কথা বলে সে অনেকটাই বদলে গেছে। বাংলাদেশে সে চলে আসবেই। মেয়েরাই আমাদের জীবনে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। আমিও সেই সময়টায় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পড়ি। তাঁর আদর্শ ও নীতি আমার ওপর ভীষণ প্রভাব ফেলে। বিদেশে থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে বারবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। সুজলা-সুফলা সোনার বাংলা আমাকে আবেগী করে তোলে। সমাজের জন্য কিছু করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ি। আমি আমার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে দেশের জন্য কিছু করব-এ ধরনের একটি প্রত্যয় আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। এক সময় আমিও সিদ্ধান্ত নিই বাংলাদেশে চলে আসব।

জাপান থেকে ফিরে স্বপ্ন ও বাস্তবতার মুখোমুখি

কারো কারো জন্য জীবন সহজ হলেও আমার কাছে তা অত্যন্ত কঠিন। কেউ কেউ যা চেয়েছে তা হয়তো পেয়েছে! আমি একজন স্বপ্নচারী মানুষ। স্বপ্ন দেখে দেখে এতটুকু বড় হয়েছি। স্বপ্ন মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। স্বপ্নের ডালপালায় ভর করে মানুষ সামনে এগোতে চায়। দেহের শিরা-উপশিরায় নতুন নতুন স্ফুলিঙ্গ দোলনা খায়। নতুন করে আশা জাগায়। শক্তি জোগায়। একটি সুন্দর প্রভাতের স্বপ্ন দেখায়। যে ভোরের সূর্যের আলোতে ধরণি নতুনরূপে সাজবে, পাখি ডাকবে, প্রজাপতি এ ডাল থেকে ওই ডালে উড়ে বেড়াবে। আসলে স্বপ্ন দেখা সহজ; কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা দুরূহ। বাস্তবতা এবং স্বপ্ন দুটোর মধ্যে বিরাট ফারাক। এমন নয় যে, কেউ তার স্বপ্নের জায়গায় যেতে চায় না। চায় সবাই। কিন্তু আসলে কি আমরা সেইসব জায়গায় যেতে পারি? বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল ও অনুন্নত দেশে জন্মগ্রহণ করে সেই স্বপ্নে পৌঁছা আরও কঠিন। কারণ, এদেশের সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষ শুধু মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছবে- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ভাবা অকল্পনীয়। বিশেষ করে চাকরি দেওয়া-নেওয়া বড়ই জটিল ও বড়ই কঠিন। এর মাঝে দারিদ্র্যের কঠিন কশাঘাতে কেউ কেউ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন পেরিয়ে বিদেশে যায়। সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা নেয়। ডিগ্রি অর্জন করে অনেকেই নিজ নিজ দেশে ফিরতে চায়। দেশকে কিছু দিতে চায়। সমাজের আনাচে-কানাচে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকা মেধাবীদের জন্য কিছু করতে চায়। বিদেশের মাটিতে বসে জীবনের দীর্ঘ ম্যাপ আঁকে। সমীকরণ অনুযায়ী এগোতে চায়। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চায়। পরোপকারী হতে চায়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান অন্যায়কে অস্বীকার করতে চায়। আমরা সবাই কি তা পারি? জাপানে দীর্ঘ ৮ বছর

থেকে নিজের দেশে এসে আমি কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। ইচ্ছে করলে আমি জাপানের গাঢ় লাল খয়েরি রঙের পাসপোর্ট নিতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার অনেক বন্ধু দেশে না এসে পাড়ি জমিয়েছে ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়। আমি নানা অনিচ্ছা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে দিয়ে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে এলাম। কি বিশাল স্বপ্ন! কিছু-না-কিছু কন্ট্রিবিউট করব এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে।

আমি নিজের চিন্তায় অটল। যে করেই হোক আমি সবার মন জয় করে ভালো মানুষ ও ভালো শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। অনার্সের পর থেকে অদ্যাবধি আমি ১৩/১৪ বার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইভা ফেস করেছি।

কোথাও কোথাও আমি ভাইভায় অনেক ভালো করেছি। ভাইভা বোর্ড মেম্বাররা কেউ কেউ প্রশংসাও করেছেন। তবুও আমি ব্যর্থ হই। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জায়গা যেখানে জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় এবং বিশ্বমানের মানুষ বানানো হয়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারিনি বিধায় এক ধরনের মানসিক চাপ কাজ করে। কী হতে কী হয়, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। শুধু পরাজিত সৈনিকের মতো এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে ঘুরে বেড়াই। এমন খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস কাজ করত। মানসিক শক্তির বলে সামনে এগিয়ে যেতে চেয়েছি।

আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। রোজা-নামাজ আর সহজ-সরল জীবনই আমার কাম্য। পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরেট এমনকি হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছি। অনার্স রেজাল্টের মেধাতালিকার মানদণ্ডে যারা আমার পশ্চাতে ছিল, তাদের অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে শুধু শিক্ষকতাই করছে না, কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদেরকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাদের জন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার নিজের কথা ভেবে এক সময় আমার দেহের কোষে বহমান ঘৃণার তেজ ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আমার বিচলিত মন আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে যায়। আমি ভাবলেশহীন হয়ে পড়ি। আমি উদাস হৃদয়ে শূন্য আকাশে তাকিয়ে থাকি। সীমান্তের ওপারের দিগন্তে সূর্যের প্রস্থানের সময় আলোর রশ্মি যেমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি আমার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। ওই দূরের তেঁতুল আর কৃষ্ণচূড়া গাছের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পাই না। লাল চোখগুলো তখন আর নিজের মনে হয় না। দুঃখগুলো এক সময় দু-গাল বেয়ে মাটিতে পড়ে বিলীন হয়ে যায়। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে একখণ্ড আকাশে উড্ডীয়মান চিলের মতো নিজেকে একাকী মনে হয়। দূরের জবুথবুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা বটবৃক্ষকে তখন খুব আপন মনে হয়।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিউজ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অনেক আগে থেকেই কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবীদের পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদের নানা ছলে-বলে-কৌশলে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছিল। এই চলমান সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরপেক্ষ, সৎ ও অকুতোভয়

বিশাল মনের অধিকারী মানুষও আজ নিজের বিবেককে পাশ কাটিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সংকীর্ণতার বৃত্ত থেকে বের হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অনেক মেধাবী সঠিকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। সেই চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করতে পারব না। আজ কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে লিড দিতে পারছি? আজ কি আমরা তাদেরকে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করতে পারছি? আজ কি আমরা তাঁদেরকে স্বপ্ন দেখাতে পারছি? অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ব্যর্থ। ফলে শিক্ষা কিংবা গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকটা পিছিয়ে আছে। বহুল প্রচলিত কথা 'শিক্ষাই শক্তি', সেই 'শক্তির' জায়গাটি খুঁজে পাচ্ছি না। চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অগণিত মেধাবী। আর জাতি হারাচ্ছে আগামী দিনে বিশ্ব পরিমণ্ডলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বরাবরের মতোই শ্রদ্ধা করি। জাপান থেকে ফিরে এসে আমি একটা জিনিস খুব ভালো করে লক্ষ করলাম যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ স্বাধীনতা-উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো এত উঁচু মানের নন। হ্যাঁ, ছোটবেলায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বই পড়লে এমনি এমনিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত। আমি হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কতিপয় শিক্ষকের সুদৃষ্টি অর্জন করতে পারিনি! এসব ভেবে আমি অনেক সময় নিজেকেই নিজে শূন্য করে তুলি। শূন্যের মাঝে ভালো কিছু না পেলেও এক ধরনের স্বস্তি খুঁজে পাই। কারণ, শূন্য কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষেও যায় না। এভাবেই চলছে জীবন। চলুক। চলতে চলতে একদিন সোনালি দিন আসবে। সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।

তো জাপান থেকে দেশে ফিরে এসে প্রথমে ফিশারিজ কলেজে (কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীতকরণ পর্যায়ে ছিল) যোগদান করি। এরইমধ্যে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত প্রফেসর, তারই বন্ধু ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাকৃবির একজন প্রফেসরের মাধ্যমে সেখানে ভাইভা দিতে বলেছিলেন এবং আশ্বস্তও করেছিলেন। ভুল করেই হোক বা পারিপার্শ্বিক কারণেই হোক, সেখানে আর আমার যাওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, বর্তমানে আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেফমবিপ্রবি) ফিশারিজ বিভাগে কর্মরত। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বশেফমবিপ্রবি মাননীয়

ভিসি স্যার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে, যারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় মেধার ভিত্তিতে আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি মহাত্মা গান্ধীর 'দ্য ট্রুথ অব এক্সপেরিমেন্ট অব লাইফ' বইটি পড়ে নিজেকে বদলিয়েছি নিজেই। নানারকম সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে দেশকে ভালোবেসে দেশে এসেছি। দেশ আমাকে সহযোগিতা করলে আমি ভালো কিছু করতে পারব। ভালো গবেষণা করে দেশকে কিছু দিতে পারব।

ভালো কিছু করাই আমার মূল লক্ষ্য। মহৎ কিছু, সুন্দর কিছু, সত্য কিছু আমাকে আনন্দ দেয়। ভালো লাগে। শান্তি পাই। পজিটিভ চিন্তায় আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন নিসৃত হয়, তা আমাকে উদ্বেলিত করে। আমি হাওয়ায় ভাসতে থাকি। মনে হয়, হৃদয়টা উজাড় করে কিছু করি। সবুজের সমারোহ এই ক্যাম্পাস আমার ভালো লাগে। এই মাঠ, এই পুকুর, এই বকুল গাছ, এই খসেপড়া প্লাস্টার বিল্ডিং আমার ভালো লাগে। এই চির সবুজ নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীদের আমার ভালো লাগে। কলঙ্কহীন তাদের মুখাবয়ব আমাকে আনন্দ দেয়। তাদের হই-হুল্লোড়, হাসি-তামাশা আমার ভালো লাগে। তাদের তারুণ্য আমাকে সজীব করে। আমি যেন শীত শেষে জীর্ণশীর্ণ গাছে কুঁড়ি গজানো ফাল্গুনের নতুন গোলাপ। যে গোলাপের গন্ধে স্মিত হাসি ফুটে আমার আপনজনের। পত্র-পল্লবে গুনগুন করে গেয়ে যায় গান। এই বিকালে বহমান ঝিরঝির বাতাসও যেন আমাকে প্রেরণা দেয়। আমি ক্লাসে সুন্দর পাঠদান করতে চাই। ভালো রিসার্চ করতে চাই। ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁটিনাটি বিষয়ে সুন্দরভাবে বোঝানো ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মাধ্যম অল্প দিনের মধ্যেই সবার প্রিয়ভাজন হয়ে উঠি। অনেকেই আমাকে ভালোবাসতে থাকে। কেউ কেউ আমাকে আইডল মনে করে। কারো কারো খুদে বার্তায় আমাকে আরও একশ বছর বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। শিক্ষকতা মহান ও মহৎ পেশা। মানুষকে সঠিকভাবে গড়ার দায়িত্ব শিক্ষকদের। কারণ, শিক্ষকরা স্টুডেন্টদের অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারেন। ভালো শিক্ষক হওয়াটাই যেন জীবনে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গ্রামবাংলার হাওয়া ও বাতাস নিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে পারলেই হয়তো আমার জীবন সার্থক হবে। সেই স্বপ্নের পেছনে জীবন চলছে, চলুক না অনন্তকাল ধরে।

জামালপুর টু গ্রামের বাড়ি

আগে ট্রেনে খুব চড়তে হতো না। কিন্তু এখন প্রায়ই ট্রেনে চড়ি। বাংলাদেশে বাস জার্নির তুলনায় ট্রেন জার্নি অনেক নিরাপদ। আর জামালপুরের মানুষের জন্য ট্রেন যেন আশীর্বাদস্বরূপ। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র কিংবা কমিউটারে টিকিট পাওয়া দুরূহ। এত লোক ট্রেনে চড়ে যে, একজনের সিট ভাগাভাগি করে দু-তিনজন বসতে হয়। ভিক্ষুক আর হকারদের দৌরাত্ম্য তো আছেই। যখন টিকিট কাটতাম, স্টেশন মাস্টারকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ৪-এর গুণিতক একটা সিট নেওয়ার চেষ্টা করতাম। শোভন ক্লাসের ৪, ৮, ১৬, ২০ প্রভৃতি সিট ব্রহ্মপুত্র ট্রেনের জানালার পাশে থাকত। জানালার পাশে বসে দশ টাকায় ঝাল চানাচুর খেতে খেতে চারপাশের সবুজের সমারোহ দেখতাম। মনটা বড় হয়ে যেত। ট্রেনের শোঁ শোঁ চলার সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যেন পেছনে হারিয়ে যেত সামনের আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু আর সামনের গুচ্ছ গুচ্ছ ছোট গ্রাম। জানালার পাশে বসে সারি সারি সুপারি গাছ, মাঠের পর মাঠ পাকা ধান, যা ছড়িয়ে আছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ওপারে- দেখে আনন্দ পেতাম। এক অন্যরকম অনুভূতি! ট্রেনের ভেতর পোড়া মানিকের বাউল গান দেশের প্রতি যেন মায়া একটু বাড়িয়ে দিত। হিরোশিমা, সিডনি কিংবা বার্লিনের মায়া যেন পালিয়ে চলে আসত আমার জানালার পাশের চোখের সামনের এসব গ্রামে-গঞ্জে। জামালপুর টাউন, নান্দিনা, নুরুন্দি, পিয়ারপুর পার হয়ে ট্রেন চলে আসত ময়মনসিংহে। সকালের ময়মনসিংহটা একটু আলাদা লাগত।

ময়মনসিংহে হকারের কাছ থেকে পত্রিকা কিনে জেনে নিতাম সাম্প্রতিক ঘটনা। ট্রেন যখন কেওয়াটখালী পার হয়ে বাকৃবির সবুজ চত্বর দিয়ে দ্রুতগতিতে পার হতো, আমি চেয়ে দেখতাম আমার ফিশারিজ ফ্যাকাল্টির দালান, সবুজ মাঠ আর জব্বারের মোড়ের টং-দোকানের চা-খাওয়া মানুষগুলোকে। ওদের চিনতাম না। কিন্তু তাদের প্রতি এক ধরনের ভালোলাগা কাজ করত। খুব আপন মনে হতো। মনে হতো ট্রেন থেকে নেমে একটু কথা বলে আসি। বারবার পশ্চিম দিকে ফিল্ড কমপ্লেক্সের দিকে তাকিয়ে দেখতাম আমার মাস্টার্স থিসিসের পুকুরগুলো। ১২/১৩ বছর আগের সেই পুকুরগুলোর কথা মনে পড়লে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। আমার নিউরন সেলগুলো যেন অবশ হয়ে যেত। দূর থেকে চুমু দিয়ে যেতাম ওইসব পুকুরকে। ভালোবেসে যেতাম তার চারপাশকে। এই মাঠ, এই রাস্তা, এই হল, এই জিমনেশিয়াম, এই আমবাগান-কোথায় আমার পা পড়েনি? ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ের সেই কাশফুল, নদীর ছলছল বয়ে চলা জল, নৌকার পাল

আজও আমায় পিছু ডাকে। ঈশা খাঁ হলের সেই লেক কিংবা জয়নাল আবেদিন অডিটোরিয়ামের লাল সিল্কের শাড়ির তরুণীর কোমর দোলানো নাচ আজও আমায় ডাকে। চলতে চলতে ট্রেন গফরগাঁও, কাওরাইদ, শ্রীপুর পার হয়ে চলে আসে লাল মাটির গাজীপুরের ভাওয়ালের অরণ্যে। রেল ক্রসিং হলে থেমে যায়, আমি নেমে যাই কাঁধের ব্যাগটি নিয়ে। সোজা চলে যাই নদী, মাঠ, ঘাট পেরিয়ে আমার গ্রামে, আমার মায়ের কাছে।

বিলের শোল মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে খেতে মা'র কাছে ভ্রমণকাহিনি বলি। মা বলেন: 'নিজ দেশের মাটি দপদপিয়ে হাঁটি।' আসলেই তাই। যত্রতত্র হাঁটা-চলা, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো, প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া-নিজ জন্মভূমির মাটি ছাড়া বিদেশে তেমনটা সম্ভব নয়। বিদেশে ওয়ার্ক পারমিট, ভিসা পারমিট ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা আছে। রেসিজম কোথায় নেই তা বলা মুশকিল! তাই দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য কিছু করার মাঝেই হয়তো আনন্দ লুকিয়ে আছে। দিন দিন এদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা অনেকটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছি। আমাদের গড় আয় ও মাথাপিছু আয় অনেক বেড়েছে। চিকিৎসাসেবার মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। মানুষের পারচেজ করার ক্যাপাসিটি বেড়েছে। মানুষের চৌকির জায়গায় খাট, টিনের ঘরের জায়গায় বিল্ডিং, রান্না করার লাকড়ির জায়গায় গ্যাস, পলিস্টার কাপড়ের জায়গায় সুতি কাপড় ব্যবহার করছে। কাঁচা রাস্তার জায়গায় পাকা রাস্তা, ফেরির জায়গায় সেতু, যানজটের জায়গায় ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে। সময়ের ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ একদিন জাপান কিংবা জার্মানির মতো হবে!

আমার গ্রামের হাওয়া খেতে ভালো লাগে। মসজিদে যাই, নামাজ পড়ি। ইয়াংদের সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক আছে। তাদেরকে নিয়ে বসি। সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি। গ্রামের প্রতি যে দায়িত্ববোধ, তা পালন করতে চেষ্টা করি। আমাদের গ্রামটি আশপাশের গ্রামগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। গ্রামকে নিয়ে ভাবি। এই অজপাড়াগাঁ, এই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ আর এই হেলে-দুলে চলে যাওয়া মাটির রাস্তায় যেন মিশে আছে হাজার বছরের মায়া আর মমতা। উড়ে চলা তালগাছের বাবুই পাখির ডানায় আর মাঝমাঠের ওই শিমুল গাছের পাতায় যেন মিশে আছে হেমন্তের সকালের শিশির ও রৌদ্রের হাসিখেলা। লাউয়ের ডগায়, কুমড়ো ফুলে, শিশিরের ফোঁটায়, কলমিশাকের বোঁটায় কিংবা খুকির নূপুরে যে আলো পড়ে, সে আলো এক সময় ম্লান হয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। তখন এক ঝাঁক চড়ুই পাখির হঠাৎ উড়ে চলার মতোই উড়ু উড়ু হয়ে যাই এই আমি। কচুরি

ফুল, শালুক, শাপলা, বক আর দূর্বা ঘাসের এই গ্রামে যখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সন্ধ্যা আসে, তখন সন্তর্পণে, নীরবে, নিভৃতে আমার এই পা হেঁটে বেড়ায় বাড়ি থেকে বাড়ি, পাড়া থেকে পাড়ায়। কুমড়ো ফুলের স্নিগ্ধতা আর লেবু পাতার গন্ধ নিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় আমি হেঁটে চলি একা একা বহুদূর পথে। ঝলমলে জ্যোৎস্নার আলোয় স্তব্ধ অতল বিলের কালো জলে লাফিয়ে ওঠে টেংরা আর পুঁটি মাছের দল। শনখেতের পাশে দূরের খালটার কোণে শিয়াল ডাকে প্রণয়ের সুরে। আর আমি বলে যাই অজানা গল্পের কথা। বুনে যাই আদর্শ গ্রাম বিনির্মাণের নানারকমের স্বপ্ন। তখন আমার স্বপ্নের ঝুড়িতে এসে বাসা বাঁধে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আর অসহায় অনাথ মুমূর্ষু মানুষের জন্য একটি হাসপাতাল। সে স্বপ্ন মিশে যায় আমার রক্তে-মাংসে আর আমি যেন কেমন উতাল-পাতাল হয়ে যাই।

গবেষণা

আমি আমার গ্রামে বেড়িয়ে এক সময় চলে আসি মালঞ্চতে নিজ বাসায়। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, কী সুন্দর অগ্রহায়ণের সকাল! মৃদু বাতাসে বিন্দু বিন্দু শিশির গাছের পাতায় জমেছে, হালকা রোদ। ক্লাস না থাকলেও চলে আসি এই ক্যাম্পাসে। তাড়াতাড়ি গোসল ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ল্যাবে উপস্থিত হই। ল্যাবকে আমি খুব ভালোবাসি। ছুটির দিন শনিবার। তবুও আমি ল্যাবে যাই। আমি ভাবি, জাপানের ওইসব গবেষণা না-করতে পারি; কিন্তু এটা-সেটা জোড়াতালি দিয়ে দেখি কিছু একটা করা যায় কি না। আমি মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ নিয়ে ভাবি। আমি জাপান থেকে অনেক কিছু ল্যাবে নিয়ে আসি। একটি পিসিআর মেশিন হলে কত ভালোই না হতো! কর্তৃপক্ষ অবশ্য একটি পিসিআর কিনে দিতে চাইলেন। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় শেষমেশ একটি পিসিআর মেশিন কিনলেন। আমি মলিকুলার লেভেলে কিছু কাজ শুরু করলাম। সম্প্রতি একটি প্রজেক্টও পেয়েছি। সব মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছে।

আমার মূল প্রেরণা আমার স্টুডেন্ট। ওরা আমাকে অনেক হেল্প করে। গবেষণার কাজটি একা করা কঠিন। তাদেরকে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করি। সকাল, দুপুর, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। বিকালে কম দামের টোস্ট বিস্কুট দিয়ে চা কিংবা চানাচুর দিয়ে মুড়ি বানিয়ে খাই। গল্প করি। ওদের মনের ভেতর এক ধরনের স্বপ্ন তৈরি হয়। ওদের চোখে-মুখে সুখের ঝিলিক ফোটে। আমার ভালো লাগে। আমার মনে পড়ে,

এভাবেই আমি একদিন বসে থাকতাম মোখলেছ স্যার কিংবা সুমিডা শেনসির সামনে। সারা দিন ল্যাবে থাকার অভ্যাসটা সেই জাপান থেকেই গড়ে উঠেছে। ল্যাবে ঢুকলে মনে হয়, আমি অন্য একটি জগতে এসেছি। মাথা ভালো কাজ করে। নিরিবিলি অনেক কিছু করতে পারি। চারপাশের পার্থিব চিন্তা থেকে দূরে থাকা যায়। সাংসারিক ঝামেলা থেকে নিজেকে পৃথক করে আগলে রাখি। অনেক নতুন নতুন আইডিয়া মাথায় আসে। এগুলো নিয়ে ভাবি। কাজ করি। আন্তর্জাতিক কোলাবরেশনে পেপার পাবলিশ করি।

গবেষণা বিষয়টি সহজ না। এর জন্য দরকার ধৈর্য ও অধ্যবসায়। আমি যখন পিএইচডির ছাত্র ছিলাম, তখন জীবনের ওপর বয়ে গেছে এক বিরাট তুফান। ফিশারিজের ছাত্র ছিলাম। পিএইচডিতে ভর্তি হলাম 'অ্যাম্ফিবিয়ান জেনেটিক্স' বিষয়ে পড়াশোনা করব বলে। একদিন মাসায়ুকি সুমিডা শেনসি (শিক্ষক) আমাকে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ব্যাঙের পায়ের একটু অংশ কেটে নিয়ে ডিএনএ এক্সট্রাকশন করতে হয়, কীভাবে পিসিআর করতে হয় ইত্যাদি। আমি এগুলো করে মোটামুটি সিকোয়েন্স পিসিআর পর্যন্ত পারি। প্রথমদিকের দিনগুলো খুব একটা খারাপ যায়নি। রুটিন মাফিক শুধু কাজ করেছি। পিএইচডির মাঝামাঝি সময়ে সায়েন্টিফিক জার্নাল পেপার লিখা শুরু করলাম। সুমিডা শেনসি বলল, যাও কুরাবায়শি সানকে (মিস্টার) আগে দেখাও। পরে আমি দেখব। কুরাবায়শি শেনসি সহকারী অধ্যাপক, হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের ল্যাবের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। উনি আমার পেপারের ভূমিকা দেখলেন। ভুল ধরলেন কয়েকশ। এই রেফারেন্স কোথেকে পেলাম, ওই রেফারেন্স কোত্থেকে পেলাম ইত্যাদি। কিন্তু আমি কিছু উত্তর দিতে পারি আর কিছু দিতে পারিনি। সে আমার পেপারের রাফ হার্ড কপিটি দূরে ঢিল দিয়ে ফেলে দিলেন। আমি আমার হার্ড কপিটি সংগ্রহ করে আমার রুমে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করলাম। কোথায় কোথায় রেফারেন্স দিয়েছি, সঠিকভাবে দিয়েছি কি না! কোথাও কোথাও যদি কিছু অমিল থেকেছে তা শুদ্ধ করে কুরাবায়শি শেনসির কাছে পরের দিন নিয়ে গেলাম। আবারও একই অবস্থা। উনি কিছুতেই আমার কারেকশনে সন্তুষ্ট নন। আবার আমি বারবার পড়ে শুদ্ধ করলাম। টানা দুই সপ্তাহ শুধু সূচনা পড়লাম। কেন ভুল হলো, কোথায় ভুল হলো ইত্যাদি। আমার চোখে কোনো ভুল নেই। কিন্তু কুরাবায়শি শেনসির চোখে অনেক ভুল। সে আমাকে অনেক কিছু বলেছে। সে কোনোভাবেই আমাকে অ্যাকসে করতে পারছে না। এভাবেই আমার অবহেলায়,

অযত্নে আর ঘৃণার গ্লানি নিয়ে দিনগুলো পার হচ্ছিল। উলটো ছিল সুমিডা শেনসি। সে আমাকে অনেক সাপোর্ট করত। যেখানে পারতাম না, সেইখানে সে আমাকে হেল্প করার চেষ্টা করত। মূলত সমস্যা ছিল আমার ফাইলোজেনেটিক এবং ইভলুশনারি বিষয়ে ডেটা এনালাইসিস এবং ডেটার ব্যাখ্যা। সুমিডা শেনসি এগুলো খুব একটা পারত না। কাজেই বাধ্য হয়েই আমাকে কুরাবায়শি শেনসির শরণাপন্ন হতে হতো। সে একজন আপাদমস্তক ইভলুশনারি বায়োলজিস্ট। যাইহোক, এভাবেই আমার জাপানের ল্যাবের জীবন পার হচ্ছিল। আমি মোটামুটি পিএইচডির রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করেছিলাম। ২০১২ সালের মার্চে আমার পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হলো। এরপর আমি পোস্টডক করলাম। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর খানেক কাজও করেছি। ২০১৬ সালে যখন দেশে ফিরে আসব বলে স্থির করলাম এবং কুরাবায়শি শেনসিকে গিয়ে বললাম: 'শেনসি আমি বাংলাদেশে একটা জব পেয়েছি, এখন চলে যাব।' সে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং ইংরেজিতে একটি বাক্য বলল: 'You are the best student among all foreign students in this lab.'

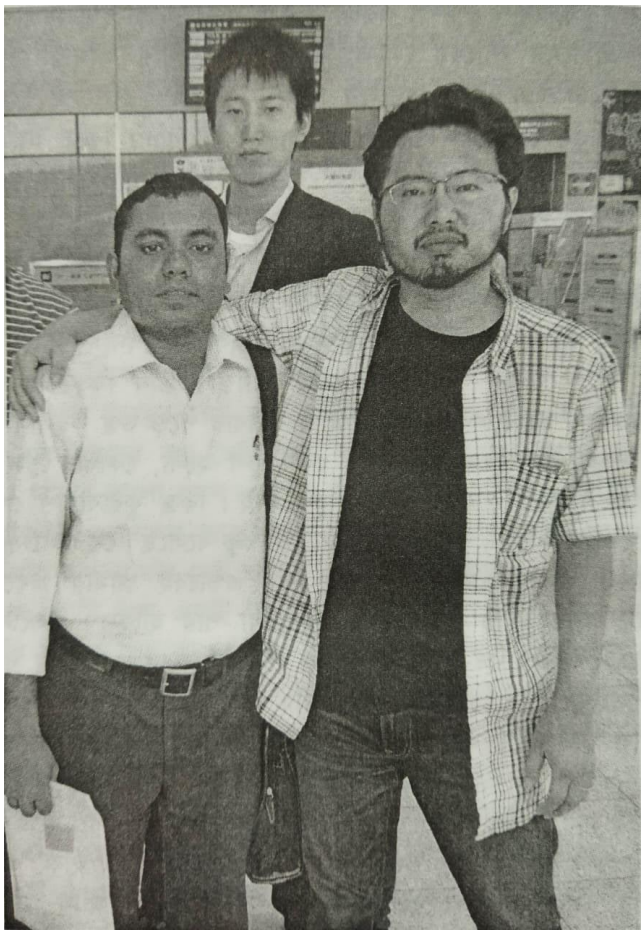

২০১৬ সালে জাপান থেকে বাংলাদেশে আসার আগে হিরোশিমা বিমানবন্দরে ফেয়ার ওয়েল মুহূর্তে কুরাবায়শি শেনসির সঙ্গে লেখক

তারপর আমি ধীরে ধীরে ল্যাবের সব জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। দুদিন পর সে আমাকে বলল: 'তোমার বিদায়ের সময় ল্যাবের পক্ষ থেকে আমরা একটি ডিনার অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছি। তুমি অমুক দিন অমুক তারিখে অমুক রেস্টুরেন্টে উপস্থিত থাকবে। আমি সময়মতো সেখানে উপস্থিত হই। সে রেস্টুরেন্ট শেষে আমাকে সব খারাপ কিছু জাপানে রেখে শুধু ভালো কিছু নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসার উপদেশ দিল। আমিও মনে মনে তাকে ক্ষমা করে দিলাম। হিরোশিমা এয়ারপোর্টে ফ্লাইটের দিন সে এবং কাকেহাশি সান উপস্থিত ছিল। আমি আরও বেশি প্রাউড ফিল করেছিলাম। দেশে এলাম। স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করছি। যতটুকু পারছি গবেষণা করছি। একদিন মেইল খুলে দেখি সে লিখেছে যে, সে আমার সঙ্গে বাংলাদেশের দু-মুখো সাপ নিয়ে যৌথভাবে গবেষণা করতে চায়। আমিও রাজি হলাম। এখনো চলছে যৌথ গবেষণার কাজ। হয়তো সে একদিন বাংলাদেশে আসবে। আমি অবাক হয়েছি এই ভেবে, যে কিনা ল্যাবে আমাকে সহ্য করতে পারত না, আমার অনেক ভুল ধরত, সেই-ই কিনা এখন আমার সঙ্গে যৌথ গবেষণা করছে। এটি আমার ধৈর্যের একধরনের বিজয় বলে মনে করি। পরিশ্রম কখনোই বৃথা যায় না।

মালঞ্চ, মেলান্দহ, জামালপুরের জীবন

আজ বিকেলটা মেঘলা। গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। ক্যাম্পাসে কেউ নেই। আমি নিজেকে কিছুটা অসহায় ভাবি, ভাবব না কেন? নানারকম অসংগতি চারপাশে। আমি নিজেকে নিয়ে এনালাইসিস করি। অন্য দশজন মানুষের মতোই ছোটখাটো দু-একটা ভুল আছে আমার। নিজেকে সৎপথে চালানোর চেষ্টা করেছি। রিপুর তাড়নায় কখনো কোনো ভুল/অন্যায়/পাপ করে থাকলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহতায়ালার কাছে মাফ চেয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমার একটা নিজস্ব ধারণা হলো: এ পৃথিবীটা পাপ করার জন্য একটি উর্বর জায়গা। ভালো ও মন্দের সংগ্রামে আমি নিজেকে বিজয়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কেননা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা মানুষ নানা খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকতে পছন্দ করি। সেই সব জঞ্জাল থেকে জীবনকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো কতই-না কঠিন!

ফাল্গুনের বিকেলটা খুব সুন্দর। ল্যাবের চারপাশে এক ধরনের সুনসান নির্জনতা। দূরের ওই যে গ্রামের বধূটি ছাগল পালছে, কোকিল কুহুকুহু গান গাইছে, ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে কৃষক গাছের ছায়ার নিচে হাঁপাচ্ছে। এরকম একটি দুপুর কার-না ভালো লাগে। ইলেকট্রিসিটিও নেই। নিজের ভেতর এলোমেলো চিন্তাগুলো নিজেকে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে তোলে। সবাই সুখী হতে চায়। কিন্তু এই এলোমেলো চিন্তা সুখকে খানিকটা ফারাক করে। ভালোবাসি বলে ভালোবাসে। পৃথিবী বড়ই অদ্ভুত। কে-না চায় জগতে খ্যাতি অর্জন করতে। কিন্তু কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেখানে পৌঁছাতে। আমি কত মানুষের বকা খেয়েছি। কত মানুষ আমাকে ঠকিয়েছে। প্রতিশোধ নিতে গেলে নিজের অনেক মানসিক ধকল নিতে হয়। এতে

শুধু শরীরের ক্ষতিই হয় না; বরং মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসে। আমি ভাবি, চলো, সবাইকে ক্ষমা করে দিই! আমাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া মানুষকে ক্ষমা করে দিই। রাতে ঘুমের আগে সবাইকে ক্ষমা করে দিলে মনে এক ধরনের প্রশান্তি কাজ করে। ভালো লাগে। আত্মতৃপ্তি পাই। ভালো ঘুম হয়।

জীবন অনেক সময় অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। কোন কাজটি কখন করা উচিত, সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক কঠিন কাজ। জীবন চলমান। চলমান এই জীবনকে সুখী করে তোলা এত সহজ নয়। চাই দৃঢ় মানসিক শক্তি এবং অটল সিদ্ধান্ত। শয়তান মানুষের মাঝে সন্দেহের জন্ম দেয়। পৃথিবী বড়ই বিচিত্র। যতদিন আছি শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা। মৃত্যু হলে সব শেষ। এসব দূরে ঠেলে দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন জীবন চাই। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। জীবনে প্ল্যান করা হয়; কিন্তু সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অনেক কঠিন।

রোজার আজ চতুর্থ দিন। বৈশাখের দাবদাহে জীবন অতিষ্ঠ। দূরের ওই পাখিটিও পেঁপে গাছের পাতার নিচে একটু ছায়া খুঁজে বেড়ায়। এরইমধ্যে বোরো মৌসুমের ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে। দিনমজুরগুলোর কষ্ট দেখলে খারাপ লাগে। নিজেরা তো এই প্রখর রোদে ফ্যানের নিচে, এসি রুমে আরামে ব্যস্ত। কিন্তু ওই যে কৃষক যার শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, পানির জন্য আত্মাটা হাহাকার করছে, সে কিন্তু আল্লাহর ভয়ে পানি খাবে না। তাপমাত্রা যথারীতি ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জীবন অসহিষ্ণু। মুসলমানদের এবারের রোজা ভয়াবহ কঠিন। মনে রাখার মতো। মহান রাব্বুল আলামিন নিশ্চয়ই সবাইকে ক্ষমা করে দেবেন।

এই তৃষ্ণার্ত পড়ন্ত বিকালে তবুও আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি। যদি আজ মরে যাই, কী হবে? কে কাঁদবে? কে হাসবে? কী দিলাম এই পৃথিবীকে? ওই যে ওইদিন সুবীর নন্দী মারা গেল। কিছু গানের জন্য হয়তো কেউ কেউ তাকে কিছুদিন মনে রাখবে। কিন্তু আমাকে কে মনে রাখবে! আর মনে রাখার মতো আমি কী করেছি? এতসব প্রশ্নে জর্জরিত হই। নিজেকে খুব অসহায় লাগে। নিজেকে শতভাগ ইমানদারও বানাতে পারলাম কি? মনে মনে তো সংশয় আছেই। তবে ভাবনা একটাই। আল্লাহ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। জীবন এলোমেলো- এতে সন্দেহ নেই। জীবনকে পরিকল্পনা মাফিক ক'জনই বা পারে চালাতে। আমিও হয়তো তাদেরই একজন। জীবন বড়ই কঠিন। আমরা চাইলেই সব পারি না। চারপাশের এত ব্যর্থতার মাঝে আমি শুধু ভাবি সামনে ইদ। কোনোরকম ইদটা পার হলেই হয়তো নতুন জীবন ফিরে পাব।

বাংলার এই রুক্ষতার মাঝেও এক ধরনের আমেজ আছে। খাঁ খাঁ রোদ। ঝিঁঝি পোকার ডাক। পাকা আমের গন্ধ। কাঁঠালের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। ছেলে-মেয়েদের বিলে-ঝিলে সাঁতার কাটা, দুরন্তপনা- সবকিছু মনে করিয়ে দেয় অতীত ও

শৈশবের কথা। অতীত মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাজ করে। মানুষকে সংগোপনে মাতিয়ে তোলে। অতীতকে ভেবে আমরা কখনো আহত হই আবার কখনো আনন্দে লুটিয়ে পড়ি। অতীত একটা বিশাল শক্তির জায়গা। একে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখাটাই শ্রেয়। হাসি-কান্নার অতীতকে আগলে রাখা উচিত। অতীতকে অস্বীকার করলে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। অতীত আমাদের কর্মে অনুপ্রেরণা দেয়। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস দেয়, শক্তি দেয়। আমাদেরকে সঠিক পথে চালানোর নির্দেশনা দেয়। শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাই নিজেকে ভালোবাসা। অতীত আছে বলেই আমরা বর্তমানকে এত সুন্দর করে সাজাই। ভবিষ্যৎকে রং দিয়ে রাঙাতে চাই।

মালঞ্চ টু বকশীগঞ্জ

মালঞ্চ- আমার ভাড়া বাসাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। চৈত্রের এই খরতাপে এই বাসাটির চারপাশের আম-কাঁঠালের বাগান আমাকে আপ্লুত করে। বিশাল এই বাড়িটির একটি কোনায় আমি থাকি। আমার রুমের পশ্চিম পাশে লেবু, পেয়ারা, আমলকী, জলপাই, চালতা, বরইসহ আম-জামগাছে ভরপুর। প্রতিদিন বিকেলে একঝাঁক ছোট ছোট শালিক দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কাঠবিড়ালি এক গাছের ডাল থেকে আরেক গাছের ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। পাশের বাঁশঝাড় আর এই বাগানের মধ্যে একটি সখ্য কাজ করে। মনে হয়, বাঁশঝাড়টি শত বছরের সাক্ষী হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এত ফুল-ফল আমাকে আনন্দ দেয়। জানালার ফাঁক দিয়ে আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। নানারকম পাখির কলকাকলিতে সকালে ঘুম ভাঙে। বাসার পাশের এই বিশাল মাঠ আমার মনকে প্রশস্ত করে। এই মাঠের বৈচিত্র্য আমাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। শীতে নানারকম সবজি আর সরিষা ফুলে ভরে যায়। পুরো মাঠ মনে হয় হলুদ রঙে সেজেছে। চৈত্রের এই পড়ন্ত বিকেলে আজ এই বিশাল সবুজ মাঠের প্রতিটি ধানখেত যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের ওপারে বাড়িগুলো যেন একেকটি গুচ্ছগ্রাম। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের মেঠো পথ দিয়ে দৌড়ে বেড়ানো মনে করিয়ে দেয় এসব শিশু কত আনন্দে আছে। পূর্ব দিকের এই মেঠো পথ দিয়ে গ্রামের বউ-ঝিয়েরা সকাল-সন্ধ্যায় হেঁটে বেড়ায়। বাড়িটির সঙ্গে আমার এক ধরনের আত্মার সম্পর্ক হয়ে গেছে। এত নীরব, নিস্তব্ধ, কোলাহলবিহীন বাড়িতে একা থাকতে ভালোই লাগে। একা থাকলে মনের কোণে ভেসে ওঠে অনেক স্মৃতি- আমার গ্রামের মাঠ, খেলার সাথি আর স্কুলের বন্ধুদের কথা।

৩৯তম বিসিএসে বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সদ্য জয়েন করেছে আমার সহধর্মিণী ডা. সাইফুন নাহার সানি। হাসপাতালের ভেতরের কোয়ার্টারে সে থাকে। তো সপ্তাহান্তে মালঞ্চ থেকে অটোরিকশায় ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ হয়ে বকশীগঞ্জে যাই। এই যাত্রায় শিমুলতলী, ডেফলা, টনকি বাজার হয়ে ইসলামপুর যেতে হয়। ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে এ জার্নি ভালো লাগে। পুরোনো ব্রহ্মপুত্রের সেই আগের জৌলুস নেই। নদীর পানি শুকিয়ে যেন হাঁটুসমান হয়ে

গেছে। নদীর ওপারের চরের মানুষ দিব্যি লুঙ্গি উঁচিয়ে হাঁটুসমান পানি পার হচ্ছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রহ্মপুত্রের ভাঙা-গড়ায় ইসলামপুর গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় এত চর যেটা আমি আগে কখনো দেখিনি। কিশোর বালিকার মাথার বেণির মতো শত শত কালো বেগুন, কাঁচা-লাল মরিচ আর হলদে ভুট্টা যেন সাজিয়ে আছে মাঠের পর মাঠ। ইসলামপুর হয়ে দেওয়ানগঞ্জ যেন আরেকটি গল্পের অবতারণা। রাস্তার দুপাশের মানুষের কৃষিকাজই যেন জীবনের সব। এত সুন্দর সবজি, ফলমূল আর আখখেত মন জুড়িয়ে যায়। দেওয়ানগঞ্জ টু বকশীগঞ্জের রাস্তা পুরোটাই চরের ওপর। শীতকালে দুপাশের সরিষাখেত দেখতে দেখতে মন জুড়িয়ে যায়। জব্বারগঞ্জ বাঁক দিয়ে যখন অটোরিকশা যায়, তখন চোখ মেললে শুধু সরিষা আর সরিষা। যেন পৃথিবীকে হলদে শাড়িতে সাজিয়েছে মাইলের পর মাইল এই সরিষাখেত।

ইন্ডিয়ার সীমান্তবর্তী বকশীগঞ্জ হাতির জন্য বিখ্যাত। পাহাড় থেকে বন্য হাতি এসে মাঝেমধ্যে সব চুরমার করে দেয়। বকশীগঞ্জে নানারকম নদীর ছোট-বড় মাছ অবশ্যই মনে করিয়ে দেয় যে, বকশীগঞ্জ এখনো প্রকৃতির খাবারে ভরপুর। খেটে খাওয়া এসব মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বাজারে আসে। সভ্যতার তেমন কোনো ছোঁয়া বকশীগঞ্জে নেই বললেই চলে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই উপজেলায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। একদিকে ভারতীয় সীমান্ত, আরেকদিকে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র আর একদিকে মূল ভূখণ্ড জামালপুর-ময়মনসিংহ। দুপুরে বাসায় ফিরে শীতের এই দুপুরে আমার ঘুম পায়। আমি চাদর বিছিয়ে, তেল মেখে মাথাটা সূর্যের দিকে হেলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এত ঘুম যে আমি সুখে বিহ্বল। আমার ছেলে আদিল হাছানের দুষ্টুমিতে আমার ঘুম ভাঙে। কিন্তু তারপরও আমার স্বপ্ন থেমে যায়নি। আমি স্বপ্না খালাকে (কাজের মেয়ে) ডাকি। খালা এক কাপ কফি এনে সামনে রাখে। আমি চুমুক দিতে চাই-দিই না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে এটা বকশীগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের কোয়ার্টার। কফির কাপে চুমুক দিতেই আমার অনীহা লাগে। ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ছে। হালকা সাদা রঙের এই প্লাস্টার খসে খসে পড়ে। দেখার কেউ নেই। কফিটা হাতে নিয়ে চলে যাই ছাদে। বিস্তর এই ছাদ আমার ভালো লাগে। শীতের আঘাতে জবুথবুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাশের কড়ই গাছটাকে খুব আপন মনে হয়। শীতের রুক্ষতায় গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। তারপর কফির গ্লাসে চুমুক দিই। দূরের এই আকাশটা বেশ বড় মনে হয়। পাশে বসতে চাইলাম। কোথাও বসতে পারিনি। ছাদে এত ঝোপঝাড় যে আমার ভয় লেগেছে। আমি কফির গ্লাসটা শেষ করতে চাই কিন্তু পারি না।

পশ্চিম আকাশে লাল আভা চলে এসেছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে, বকশীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতরের সোডিয়াম লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। খালা ছাদে এসে আমাকে ডাকতে চায়- পারে না। কারণ, আমি একলা থাকতে পছন্দ করি। চারপাশের নিস্তব্ধতা আমাকে সুখ দেয়। খালা ডাকতে এসেও ফিরে যায়। আমি হারিয়ে যাই আকাশের বিশালতায়। বকশীগঞ্জের আকাশ আজ আমার কাছে অন্যরকম লাগে। পাশের চড়ুই পাখিটির ডাক আমার ভালো লাগে। আমি চোখ

বুজে রাস্তার পাশের হলুদ সরিষা ফুল দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ দেখতে পারছি না। কাঠগাছটির ডাল ছাদে এসে পড়েছে। আমি কাছে গিয়ে সবুজ দুটো পাতায় আদর করছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি সন্ধ্যায় এই গোধূলি লগ্নে হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রতিমাকে আদর করছি। আমি ওখান থেকে সরে আসি। আমি নিজেকে চিনতে চাই। কফি খাওয়া শেষ হয় না। রশিতে টানানো কাপড়ের সুঘ্রাণ আমাকে আপ্লুত করে। আমি কাপড় ছুঁয়ে চুমু খেতে চাই-পারি না। কারণ, এই ঘ্রাণ আমাকে নিয়ে যায় অতীতের কোনো কালে যেখানে হাজার বছরের পুরোনো পথে হাঁটছে সেই ঘ্রাণ। আমি ছুঁতে গিয়েও পারি না। আমি কষ্ট পাই। আমার দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে শীতের হিম বাতাস বয়ে যায়। এক সময় সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে। আমি নিজেকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলি। খালা ডাকছে। আমি শুনেও শুনতে চাই না। আমি চাই জোনাকি পোকা আমাকে ঘিরে ফেলুক। আমি চাই দূরের তারাটি আমাকে ডাকুক। আমি চাই অন্ধকারে একা একা ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হেঁটে বেড়াই। আমি চাই রাতের নিস্তব্ধতা আমাকে ঘিরে ফেলুক। আমি চাই ছাদের পাশের কড়ই, বট কিংবা সুপারি গাছের সঙ্গে আমার একটা সখ্য গড়ে উঠুক। আমি চাই সীমানার ওপারে দূরের ওই নববধূর কেরোসিনের কুপির আলোয় আমি ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হই কিংবা দূরের ওই বৃদ্ধার হারিকেনের আলোয় আনন্দে মেতে উঠি।

খালা ডাকছে তো ডাকছেই। আমি এক সময় অনুভব করি, আমাকে ঘরে যেতে হবে। ঘরে ঢুকেই দেখি নানারকম খাবারে টেবিল ভরা। এত সুগন্ধি খাবার কোনোটাই আজ আমাকে টানছে না। মনে পড়ছে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের কাশফুলকে, মনে পড়ছে স্কুলে যাওয়ার সময় হাসনাহেনা কিংবা বেলিফুলের ঘ্রাণের কথা। ওই কাশফুল আর বেলিফুলের ঘ্রাণ নিয়ে ইচ্ছে হয়েছিল হেঁটে দূরে যেতে; বহুদূর। আমি এতসব মজার খাবার কিছু খেতে না খেতেই খুব হাঁপিয়ে উঠি। এরপর রাতের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে এক সময় ঘুমিয়ে যাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্যমামা এখনো উঁকি দেয়নি। তার আগেই রাতের ডিউটি শেষ করে প্রিয়তমা বাসায় ফিরেছে। বকশীগঞ্জের এই হাসপাতালের ডাক্তারদের এই কোয়ার্টার আমার খুব ভালো লাগে। দেশের এত সব ব্রিলিয়ান্ট মানুষের সমাগম এখানে। সাদা অ্যাপ্রন আর সার্জিক্যাল মাস্কপরা ডাক্তারদের দেখতে আমার ভালো লাগে। বারবার দাঁড়িয়ে আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। আমার সুখ লাগছিল। এত মেধাবী এরা অথচ এত নোংরা ওদের কোয়ার্টার। উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও সাহেবের আলিশান বাড়িটি আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা বিসিএস মেধাবী ডাক্তারাও প্রাপ্য সম্মানটুকু পান না। কত ডাক্তারকে মার খেতে দেখেছি। ডাক্তাররা মেধাবী; কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অনেক অভাব। অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকা এসব ডাক্তারের কেউ কেউ ইদানীং মানবসেবা বাদ দিয়ে বিসিএসে পুলিশ, প্রশাসন কিংবা ফরেন ক্যাডারে ঢুকছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের এসব কষ্ট দেখে আমার

হাসি পায়। আমি হাসি। আজ আমার হাসতে ভালো লাগছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটা আমার ভালো লাগছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কোনো এক বিলের ধারে। কংশ নদীর পাড়ে অথবা হিজল, বট, নারিকেল বনের ভেতর। আমার ইচ্ছে করছে এই সরকারি কোয়ার্টারে না থেকে দূরের গ্রামের নারিকেলের ছায়ার নিচে টিনের ঘরে থাকতে। এসব ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মনে হয় ম্লান হয়ে আমি মিশে যাচ্ছি কোনো নক্ষত্রে কিংবা পত্র-পল্লবের অরণ্যে।

বকশীগঞ্জ থেকে আমি চলে আসতে চাই। রিকশায় উঠি। রিকশা নিয়ে গ্রামের ধুলো মাঠ-ঘাট পেরিয়ে একটি নদীর ঘাটে এসে পৌঁছি। ছোট নদী কিন্তু পানি বহমান। মনে হচ্ছে শতাব্দীকাল থেকে শুধু বয়ে চলেছে। টাকা পরিশোধ করে রিকশাওয়ালাকে বিদায় করি। নৌকায় নদী পার হই। এই চর আগে কখনো দেখিনি। ধুধু বালি আর বিস্তীর্ণ মাঠ। আমি হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে বহু মাইল পার হয়ে এসেছি। রাস্তার দুপাশের মানুষগুলোকে খুবই জীর্ণ-শীর্ণ মনে হলো। ইসলামপুর হয়ে মালঞ্চ চলে আসি। বাইরের আকাশ, গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়িতে, ঘাসের ডগায়, পাখির পালকে সন্ধ্যা হয়। আমি কাপড়চোপড় ছেড়ে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কল্পনায় আমি

চৈত্রের এই দুপুরটা খুবই নীরব। চারপাশে কোলাহল নেই। সবকিছুই করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউনে আবদ্ধ। বাংলাদেশ আজ এক নতুনরূপে ও সাজে আবির্ভূত। সব রাস্তাঘাট ফাঁকা। কৃষকেরা যার যার ঘরে। তবুও এই চৈত্র মাসে কেউ কেউ মাঠে কাজ করছে। শ্যালো মেশিনে ধানখেতে পানি দিচ্ছে। মাঠের পর মাঠ সবুজের সমারোহ। ধান প্রায় বের হয়ে আসছে। আগামী ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই ধান কাটার মৌসুম শুরু হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ আগে কখনো এত বেশি আতঙ্কিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্ভবত এটিই সবচেয়ে বেশি খারাপ সময়ের মধ্যে যাচ্ছে মানুষ। গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আজ বিপর্যস্ত। ওই যে দূরের পাড়ায় স্কুলপড়ুয়া মেয়েটির মুখ আজ শুষ্কতায় পরিপূর্ণ। কোথাও সজীবতা নেই, সবটাই বিবর্ণ। দূরের আমগাছের পাতা রোদে ঝিকমিক করছে। এই তপ্ত প্রখর রোদে ভুট্টা তুলে কেউ রোদে শুকাচ্ছে। কেউবা মরিচ তুলছে। গ্রাম্য জীবনের এই সবুজ ধানখেত, লাল মরিচের খেত কিংবা ভুট্টার হলুদাভখেতের কোনোটিরই কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। চিকচিক রোদ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক মনে করিয়ে দেয় আম-কাঁঠালের কথা। আমের মুকুলগুলো সবেমাত্র গুটি ধরা শুরু করেছে। কাঁঠালের মুচিগুলোও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। দুপাশের ধানখেতের আইলে কৃষক গরুর জন্য ঘাস কাটছে। কত বছর হয়ে গেল আমার পা এই ঘাসে পড়েনি। এই ঘাসের মধ্যে একটি ঘ্রাণ আছে। কৃষকের ঘর্মাক্ত শরীর আর খেতের আইলের এই ঘাসের গন্ধ আমি কত বছর পাই না। আমার মনে হয়, এরকম একটি মাঠ আমার চাই। যেখানে আমি খালি পায়ে দূর্বা ঘাসে হাঁটব। ধানখেতের সোনালি

ধানের সঙ্গে রোদের খেলা দেখব। আম-কাঁঠালের গন্ধে ভরা উঠোনটায় আমি গড়াগড়ি দেব। মানুষের কল্পনাই শক্তি। কল্পনায় মানুষ আশা জাগায়। আশা আর কল্পনা একে অপরের পরিপূরক। আশা আছে বলেই আজ টিকে আছি। হাজারো দুঃখের মাঝে আমি আজও আশা দেখি। চৈত্রের খরতাপ আমার কল্পনাকে ম্লান করে দিতে পারে না। লেবু দিয়ে ঠান্ডা শরবত খেতে খেতে এগুলোই আমি ভাবি। আমার অবসর আমার অতীতে নিয়ে যায়। ফিরে যাই শৈশব, কৈশোর আর যৌবনে। হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে খুঁজে পাই চৈত্রের এই ভরদুপুরের উষ্ণতায়।

এভাবেই আমি আজ অবলোকন করছি বাংলার প্রকৃতিকে। এই চৈত্রের খরতাপের মাঝেও শকুন মুক্ত আকাশে অনবরত পাক খাচ্ছে। আচ্ছা এরা এতবার আকাশে ঘুরে কি সুখ পায়? আমার জানতে ইচ্ছে করে। কাঠঠোকরা লম্বা সুপারি গাছে ঠুক ঠুক করেই যাচ্ছে। হালকা বাতাসে বাঁশঝাড় হেলেদুলে দোল খাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ ধানখেতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা মৃদু বাতাস আমাকে সুখ দিচ্ছে। আমি পাখির সঙ্গে ওই বাঁশঝাড়ের সঙ্গে, ওই সুপারি গাছের সঙ্গে, সখ্য করতে চাই। আমার মন অনবরত চলে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। গগনে গগনে কহে বেড়াচ্ছে গল্প।

আজ আমার কাছে এই ছোট্ট মৌমাছিটিও গুরুত্বপূর্ণ। ফুলে ফুলে সারা দিন বয়ে বেড়ানো মৌমাছিটি ভুল করে আমার রুমে ঢুকেছে। কী যেন খুঁজতে চায়। খুঁজতে গিয়ে ফিরে আসে। এই মৌমাছিটিও আজ আমার খুব প্রিয়। আমিও বারবার খুঁজতে গিয়ে জীবনে বহুবার ফিরে এসেছি। সারাটি ঘর তন্নতন্ন করে কী যেন খোঁজে মৌমাছি। চৈত্রের দুপুরে দূর থেকে আমি তা দেখে সুখ পাই। আমার অনুভূতিগুলো প্রখর হয়ে ওঠে। আমিও এই পৃথিবীতে হয়তো ব্যর্থ মৌমাছি। কিন্তু মৌমাছির মতো আমিও হাল ছাড়িনি। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে রানিকে দেয় আর মৌচাক বানায়। মৌমাছির মতো আমিও পরিশ্রমী হতে চাই। না পাওয়ার ব্যর্থতাকে পুঁজি করে আমি এগিয়ে যাই। ব্যর্থতার মাঝেও এক ধরনের সুখ আছে। হাজারো ব্যর্থতার একটু একটু সুখ জমে একদিন অনেক বড় সুখ হবে। আমি সুখের মৌচাক বানাতে চাই। ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ-এটাই আজ আমার কাছে মুখ্য।

এই ক্লান্ত দুপুরে আমিও এক সময় ম্লান হয়ে যাই। মৌমাছি মধু জমায় আর আমরা মধু খাই। এই মৌমাছির মতোই কি পারি না আমার জীবনটাকে সাজাতে। চৈত্রের এই ভরদুপুরে আমি একা একা ভাবি। আমার হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালো কাজ এক সময় বড় হয়ে মৌচাকের মতো হবে, সেখান থেকে সবাই মধু পাবে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ উপকৃত হবে-এটাই আমার চাওয়া।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমি ঘাসফড়িং হতে চাই না। আমি মৌমাছি হতে চাই। ব্যর্থতার মাঝে আমি দাঁড়াতে চাই, পরিশ্রম করতে চাই, কিছু করতে চাই-

ভালো কিছু, মহান কিছু, মহৎ কিছু। চৈত্রের এই দুপুরের কাছে এটাই আমার চাওয়া ও প্রতিজ্ঞা।
চৈত্রের শেষ দিনগুলো বুঝি এমনই হয়। হঠাৎ ভ্যাপসা গরম। ধানখেতে কোলা ব্যাঙের ঘোঁতঘোঁত ডাক। আকাশ মেঘলা, ঝড়ো হাওয়া। মাকড়সার জালের মতো আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে। আমি ভয়ে তটস্থ। দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দিলাম। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। হঠাৎ ধুমধাম করে বৃষ্টি। ইরি ধানের জন্য বৃষ্টিটি আশীর্বাদ হয়ে এলো। অপেক্ষা আর অপেক্ষা করছি কখন ইলেকট্রিসিটি আসবে। না আসেনি। এদিকে মশার কামড়। নিজেকে প্রকৃতির কাছে অসহায় মনে হচ্ছে। অন্ধকার পরিবেশে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি নেই। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় পৃথিবী আলোকিত। জানালার ফাঁকে ধানখেতের ওপর এই আলো-আঁধারির খেলা আমার খুব ভালো লাগছিল। পৃথিবীর সবাই ঘুমে। আমি ভেসে যাচ্ছি চাঁদের আলোর সাগরে। এ এক অন্যরকম ধরণি। মৃদু শীতল হাওয়া আর চাঁদনি রাতের নীরবতা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। আজ আমি ঘুমাতে চাইনি। আমি চুপচাপ জানালার ফাঁকে বসে দেখছি চাঁদ আর তারার খেলা। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে এই ধ্রুবসত্যকে অবলোকন করতে হলে বসে বসে চাঁদ দেখতে হবে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়।নিজেকে হারাতে থাকি মনে পড়ে রুনা লায়লার গান: 'যখন থামবে কোলাহল...'। আমি কল্পনায়

এক সময় বাঁশঝাড় আর কবর আমার ভয় লাগত। আজ ভয় লাগছে না। ধানখেতের এই বিশাল এক কোণে বাঁশঝাড় আর কবর আমার খুব আপন মনে হচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোয় বাঁশঝাড়টিকে আজ চিরহরিৎ অরণ্যের মতো দেখায়। ছোট ছোট কলাগাছের পাতা শীতল বাতাসে দুলছে আর মনে হচ্ছে দূর থেকে আমাকে ডাকছে। রাতের এই নির্জনতাকে সবাই উপভোগ করতে পারে না। আমি উপভোগ করছি। পাতলা কাঁথাটি গায়ে দিয়ে মশারির ভেতর আমি জবুথবু হয়ে বসে আছি। চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার সখ্য বেড়েই চলছে। জ্যোৎস্নার আলো জানালার ফাঁক দিয়ে আমার হাতের ওপর পড়ছে। ভাবি, জ্যোৎস্না তুমি কার? জ্যোৎস্নার আলোয় আমার হাতের লোমগুলো ক্রমশ ম্লান দেখাচ্ছিল। সারা জীবন ধরণিকে আলো দিয়ে যাওয়া চাঁদকে বলতে ইচ্ছে করে: তুমি আরেকটু জ্যোৎস্না দাও। আমি বসে থাকতে চাই, প্রকৃতিকে অবলোকন করতে চাই। নিশিরাতে হিমেল হাওয়া আর জ্যোৎস্নার আলো যে কাউকেই সজীব করে তোলে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ধানের পাতায় জ্যোৎস্নার আলোয় রুপার মতো ঝিলিক দিচ্ছে। এভাবেই রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেল। বুঝতেই পারিনি একটা রাত এভাবেই শেষ হয়ে গেল। পূর্ব আকাশের চাঁদটিও ইতোমধ্যে পশ্চিম আকাশে এসে গেল। মসজিদে মসজিদে আজানের সুমধুর ধ্বনি বাজতে শুরু করল। ঘুমিয়ে থাকা পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে চঞ্চল হতে শুরু করল। গাছের ডালে পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করতে লাগল। কর্মব্যস্ত মানুষগুলো ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সুবহে সাদেকের আলো একসময় দিনের আলোর সঙ্গে মিলিয়ে

গেল। আমি বসে আছি। প্রকৃতির এত ধীরস্থির পরিবর্তন আমি পর্যবেক্ষণ করছি। আমি স্থির কিন্তু পৃথিবী চলছে তো চলছেই তার নিজস্ব গতিতে। আমার এসব দেখে ভালো লাগে। সূর্যের স্থির আলোটাও জানালা ভেদ করে এক সময় আমার কাছে চলে আসে। তাকেও আমি আদর করতে চাই। কিন্তু পারি না। সূর্যরশ্মির প্রখরতা আমাকে ঘামিয়ে তোলে। চাঁদের আলোর যে নির্মলতা, সূর্যরশ্মি ঠিক ততটাই নির্মলহীন। ভাবলেশহীন এই সূর্যরশ্মিকে আমি ঘৃণা করি।
ধানের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটাকে শিশির মনে হয়। প্রজাপতি আর ঘাসফড়িং উড়ে বেড়ায়। কর্মচঞ্চল মানুষগুলো কাজের টানে ছোটাছুটি করছে। গাড়ি, বাস যার যার মতো ছুটে চলছে। পাশের বাড়ির ছোট্ট সোনামণিটি কাঁদছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। কৃষক খেতে কাজ করছে। নীরব নিস্তব্ধ কর্মহীন এই ধরণি কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণচঞ্চল হয়ে

গেল। মানুষ কীসের পেছনে যেন ছুটছে! দূর স্বপ্নের পেছনে? অনন্তকাল ধরে শুধু ছুটেই চলবে? আমি বসে আছি। চারপাশে কেউ নেই। রাত ও দিনের এই বিশাল ব্যবধান আমি অবলোকন করছি। প্রকৃতির এই অমোঘ বিধানে আমরা সবাই ছুটছি। স্থির হয়ে থেমে থেমে অবলোকন করার কেউ নেই। চলছি তো চলছিই। লাগামহীনভাবে এভাবে চলতে থাকা কার-না ভালো লাগে? আমিও চলতে চাই। আমিও ব্যস্ত হতে চাই। আমিও দিনের আলোয় নিজেকে স্নান করাতে চাই। কর্মচঞ্চল মানুষের কাতারে আমিও শামিল হতে চাই। হারিয়ে যাই হাজারো মানুষের ভিড়ে কোনো এক অদৃশ্য স্বপ্নের পেছনে ঘুরে।
আজ আমার কাছে এই ক্ষুদ্র পিপীলিকাই আদর্শ। দেওয়ালে চলমান পিপীলিকার কোনো ভয় নেই। রীতি-নীতি নেই। সারিবেঁধে এক দেওয়াল থেকে আরেক দেওয়ালে যাচ্ছে। নেতাকে অনুসরণ করার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এই পিপীলিকা। দেহের চেয়ে কয়েকগুণ বড় জিনিস টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। ওদের চলার কোনো শেষ নেই। পিপীলিকার মতো কি হতে পারি না আমি? আমি অবিরাম চলতে চাই, নিজের চেয়ে কয়েকগুণ বড় বোঝা বহন করে নিয়ে যেতে চাই। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে আজ আমার তাই-ই মনে হচ্ছে। পিপীলিকাকে প্রতিদিন দেখি। কিন্তু আজকের মতো আগে কখনো ভাবিনি। আমিও অনুসরণ করতে চাই, ভালো কর্মী হতে চাই। কিন্তু প্রেরণা জোগানোর মতো, অনুসরণ করার মতো নেতা খুঁজে পাই না। নিজের ভেতর এক শূন্যতা কাজ করে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে পায়ে ঠেলে দিলেও আবার অন্য পথ দিয়ে রাস্তা বানায়। আমাকেও যখন কেউ ঠেলে দেয়, আমিও কি অন্য পথ খুঁজে নিতে পারি না?
জীবনকে একটি সাধারণ সূত্রে ফেলা যায় না; যায়-আমি ভাবি। আমিও পিপীলিকার মতো ওই সাধারণ সূত্র মেনে চলতে চাই। শতসহস্র বাধা-বিপত্তি, নির্যাতন, অত্যাচার, অপমান আর গ্লানি ঠেলে একটি পথ খুঁজে পেতে চাই। যে পথ আমাকে নিয়ে যাবে দূরে-বহুদূরে- আমার লক্ষ্যে। শারীরিক শক্তির চেয়ে

মানসিক শক্তির ক্ষমতাটাই বেশি। পিপীলিকাকে দেখে আজ আমার মানসিক শক্তির ডানাগুলো মেলে ধরেছে। আমি হাঁটতে চাই, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। তবুও খুঁজে পেতে চাই আমার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। স্বপ্ন এমনই হয়। যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না; কিন্তু প্রেরণা দেয়, শক্তি দেয় অদম্য ছুটে চলার প্রত্যয় তৈরি করে নিজের ভেতর। পিপীলিকা, তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে শিখিয়েছ কীভাবে নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়। না পাওয়ার বেদনা আমার আছে। মানুষের কটাক্ষ আর গ্লানি খাওয়ার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু তবুও আজ আমি থেমে থাকতে চাই না। আমি উঠে দাঁড়াতে চাই। শক্তি নিয়ে চলতে চাই। লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই। শারীরিক শক্তির ক্ষয় হতে পারে; কিন্তু মানসিক শক্তির কোনো ক্ষয় নেই। এটি পিপীলিকার মতোই বংশবৃদ্ধি করে। আজ আমি ১০টি পিপীলিকাকে মেরে দেখলাম। তারা কী করে? তারা পথটাকে একটু পরিবর্তন করে আগের নিয়মেই অবিরাম হেঁটেই চলেছে। আমিও পিপীলিকার মতো মানসিক ডালপালাগুলোকে শতসহস্র বৃদ্ধি করে নতুন নতুন পথে চলতে চাই।

শালিক পাখিটির জীবন আমার খুব ভালো লাগে। হালকা লালচে রঙের পাখিটি খুব ভোরে ওঠে। আমার ঘরের কোণের জলপাই গাছে তার বাসা। উঠেই কিচিরমিচির শুরু করে। দিনটি শুরু হয় এই পাখিটির ডাকেই। পাখিটির জীবনে চাওয়া খুবই সামান্য। কিছু পোকামাকড় খেয়েই তার জীবন। দরজা খোলা পেয়ে পাখিটি কখনো কখনো আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। খই, ভাত কিংবা অন্য কিছু থাকলে সে রুমে ঢুকে খেয়ে নেয়। আমি আশ্চর্য হই, সে একটুও আমাকে দেখে ভয় পায় না। মনের নিজস্ব খেয়ালে সুন্দর করে টুপটাপ হাঁটে। কোনো শব্দ নেই। কিন্তু দারুণ একটা আর্ট আছে তার হাঁটায়। নীরবে-নিস্তব্ধে সে আসে-যায়। হঠাৎ উড়াল দিয়ে সিলিং ফ্যানে আবার মেঝেতে বসে। কোনো ভয় নেই। সারা দিনই টুকটাক এটা-সেটা খোঁজে। যা পায় তাই-ই খায়। জীবনে কোনো টেনশন নেই। চাওয়া নেই, হতাশা নেই। দিব্যি সকাল-বিকাল মনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো দলবেঁধে, কখনো একা। সে তার মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমিও শালিকের মতো বাঁচতে চাই। একদম এই জলপাই গাছের শালিকের মতো। দোয়েলের মতো বাঁচার দরকার কী! শালিক এবং দোয়েলের জীবনের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। আমার কাছে দোয়েল এবং শালিকের জীবন একই। আমি শালিকের মতো সহজসরল সুন্দর জীবন চাই। শালিকের মতো স্বাভাবিক জীবনটাই আমার কাম্য। কোনো শ্রেণিবিন্যাসগত পদবি কিংবা জাত নিয়ে বাঁচতে চাই না। আমি চাই পর্দার অন্তরালে গ্লানিহীন ধীরে সয়ে রয়ে যায় জীবন-যে জীবনের কোনো স্রোত নেই, বেগ নেই, প্রলয় নেই, হুংকার নেই। আছে নরম, মসৃণ, কোমলতা আর ধীরে চলার মোহ। ধনী-গরিব, বড়লোক-ছোটলোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উঁচু-নীচুর মধ্যে পার্থক্য আমার ভালো লাগে না। সবার জন্য জীবনের সূত্র যদি একই হয় তাহলে ওই সাড়ে তিন হাত কবরই আমার সম্বল। আমি ওখানে সাধারণ মানুষ হিসেবে যেতে চাই; অসাধারণ

হয়ে নয়। অসাধারণ হওয়ার যে জ্বালা আর যন্ত্রণা সেটি আমি চাই না। কোনো খ্যাতি, যশ, অর্থ-বিত্ত কিছুই চাই না। চাই একটি শালিকের মতো ধীরে চলা জীবন। ক্লেশহীন নিখাদ জীবনেই সুখ বেশি। জঞ্জালমুক্ত জীবন চাই। বিদ্রোহ চাই না, কম্পিটিশন চাই না, হানাহানি চাই না, সংঘাত চাই না, হিংসা-বিদ্বেষ চাই না, চাই নদীর জলের মতো স্বচ্ছ জীবন। শালিকের কিচিরমিচিরের মতো আমিও সাধারণ মনুষ্যজাতিকে জানাতে চাই: উঠুন, চলুন বয়ে যাই ধীরে, সয়ে যাই সব গ্লানি, ভুলে যাই বিভেদ, মিশে যাই সবার তরে। কেউ আমাকে আঘাত করলে আমি তাকে ভালোবাসতে চাই। কেউ আমাকে হেয় করলে আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে চাই। গান্ধীজির অহিংস নীতি আমার খুব ভালো লাগে। অহিংস নীতি নিয়ে বাঁচতে চাই, শিখতে চাই, বড় হতে চাই। পৃথিবীর এই হাজারো বিভেদের মধ্যে আমি সুখ চাই ভালোবেসে, পরোপকার করে, দুঃখ সহ্য করে, চোখ বুজে সত্যের আশ্রয় নিয়ে।

গ্রামই আমার পছন্দ। অবারিত মাঠ, মুক্ত আকাশ, ধুলাবালি মাখা তাল আর সুপারি গাছে ঘেরা রাস্তা পাড়ার পর পাড়া ভেদ করে চলছে তো চলছেই- এগুলোই আমার পছন্দ। মসজিদের কোনায় বিস্তৃত দিঘিটার ওপরে বিশাল বটগাছটিই আমার প্রিয়। চৈত্রের দুপুরে বটগাছের ডালের ছায়ায় দিঘির কালো শীতল পানির ওপরে ভেসে বেড়ানো পোকাটিই আমার আজ প্রিয়। দিঘির ঘাটে গোসল করা ওই তরুণ-তরুণীটিই আজ আমার প্রিয়। কোলাহল ও জঞ্জালমুক্ত শহর থেকে আমার গ্রামই সুন্দর। লাঙল আর জোয়াল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাওয়া ওই কৃষানই আমার প্রিয়। ধানখেতে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া কৃষকের মতো দুপুরের খাবার ওই বটগাছের ছায়ার নিচে খাওয়াতেই আমার সুখ। তপ্ত দুপুরে গামছা বেঁধে ওই রাখালের বাঁশির সুরই আজ আমার প্রিয়। বিলে-ঝিলে জাল দিয়ে মাছ ধরে আনাটাই আজ আমার সুখ। শালুক, পদ্ম, হেলেঞ্চা আর কলমিলতা কুড়াতেই আজ আমার সুখ।

ট্রাফিক জ্যাম, এত এত ময়লা ফেলে রাখা ডাস্টবিন, অনবরত হর্ন আর দূষিত কালো ধোঁয়ার এই শহর আমি চাই না। আমি ওই গ্রামেই থাকতে চাই। শহরের বড় বড় অট্টালিকায় হাজারো মানুষের ভিড়ে এই অলি-গলিতে চলতে চাই না। গ্রামের সেই আঁকাবাঁকা আল দিয়েই আমি হাঁটতে চাই। আমি হিরোশিমায় থাকতে চাই না, আমি টোকিওতে থাকতে চাই না। আমি চাই আমার এই ছোট্ট গ্রামে থাকতে। আমি বার্লিনের স্প্রি নদীর হিম-শীতল বাতাস খেয়ে বড় হতে চাই না। আমি চাই আমার ঘরের পাশ দিয়ে এই ধানখেতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা মুক্ত বাতাস খেয়ে বড় হতে। আমি সিডনির হারবার ব্রিজ দিয়ে হাঁটতে চাই না। আমি চাই আমার গ্রামের খালের ওপর বেঁধে রাখা সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটতে। আমি কানাডার ভ্যানকুভারের সমুদ্রসৈকত দেখতে চাই না। আমি চাই পুরোনো ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কাশফুলের মধ্য দিয়ে একটি বিকাল হেঁটে যেতে। আমি তাইওয়ানের ১০১ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার স্কাই ভিউ দেখতে চাই না। আমি আমার ঘরের ফাঁকে বসে বাঙলার গোধূলি বেলার সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখতে চাই। চায়না, বেইজিং কিংবা কুনমিং শহরের এত রং-বেরঙের

ফলমূল আমি চাই না। আমি চাই আমার এই বাংলায় বেড়ে ওঠা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, ডালিম, আনারস আর বরই। পৃথিবীর এতসব আধুনিকতার ছোঁয়া আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে এই পিপীলিকা আর শালিকের মতো আমার এই গ্রামে থাকতে।

ঢাকা শহরের গুলশান, বনানীর আলিশান বাড়ি আর আধুনিকতা কিংবা আভিজাত্যে ভরপুর এই কৃত্রিম বড়লোকি আমার ভালো লাগে না। ফার্মগেট কিংবা গুলিস্তানের এই কোলাহল আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের মেঠো পথে চলা এই রিকশা, ভ্যান আর ঠেলাগাড়ি। আমার এই টাই-স্যুট পরতে ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে একটি টি-শার্ট আর সাধারণ একটি জিন্স। ঢাকা শহরের এই ফাস্টফুড আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে সাদা ভাত, ডাল-সবজি আর বেগুনের ভর্তা। ঢাকা শহরের কলাবাগানের মামা হালিম আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে আমার ঘরের পাশের খেতের কাঁচা মরিচ দিয়ে কাঁঠালের মুচি আর জলপাইয়ের ভর্তা। কলাবাগানের লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের সেই খালের পাশ দিয়ে হাঁটতে। সংসদ ভবনের সামনে বকুল গাছের তলায় বসে বাদাম খেতে আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে মায়ের হাতের খই বাড়ির পাশের বাঁশের মাচায় বসে খেতে। মানিক মিয়া এভিনিউর এত বড় প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে আমার চলতে ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের মেঠো পথের গরুর গাড়িতে চড়তে। ফার্মগেটের ওভারব্রিজ দিয়ে হাজারো মানুষের ভিড়ে চলতে আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে চরের ওপর আলুখেতের পাশ দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় হাঁটতে। মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ঘুরতে আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের ওই শিমুল গাছের তলায় চৌরাস্তায় বসে আড্ডা দিতে। ঢাকা কলেজের উলটোপাশের বনফুলের রসমালাই আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে আমার গ্রামের হাটে বিক্রি করা স্যাকারিনের রসগোল্লা। নিউমার্কেটের এতসব নামিদামি ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের হাটের খোলা বাজারে বিক্রি করা হাফ হাতা শার্ট কিংবা নেভিব্লু ফুল প্যান্ট। বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্স, মতিঝিলের মধুমিতা কিংবা নিউ মার্কেটের বলাকা সিনেমা হলে আমার ছবি দেখতে ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে আমাদের গ্রামের খান বাড়িতে বৈশাখী মেলায় বায়োস্কোপ দেখতে।

কাওরান বাজারের এত সব নামিদামি মুদির দোকান ও থরে থরে সাজানো সবজি আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের বটগাছের নিচে সকাল বেলায় উন্মুক্ত মাঠে বিক্রি করা কচু, লাউ, হেলেঞ্চা আর ধনেপাতার গন্ধ নিতে। বসুন্ধরার ১০ তলার সেই বাহারি রকমের নুডলস আর স্প্যাগোটি আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে বটগাছের নিচের সকাল বেলায় জদু মিয়ার চিতই পিঠা কিংবা রইস আলীর ভাপা পিঠা খেতে।

ঢাকার এই চাকচিক্য আর সন্ধ্যায় সোডিয়াম লাইটের আলো আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের এই নিভৃত পল্লিতে কুপি আর হারিকেনের আলো। টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের পোস্টম্যানের হাতের হলুদ খামের চিঠি। মিরপুরের চিড়িয়াখানায় এত সব বাঘ-ভালুক দেখতে আমার ভালো লাগে না; আমার আমার ভালো লাগে গ্রামের আখখেতে কুকুর আর শিয়ালের দৌড়াদৌড়ি দেখতে। কাঁটাবনের খাঁচার ভেতর খরগোশ আমার ভালো লাগে না; ভালো লাগে মিউ মিউ করা ঘরের কোণের বিড়ালটি। সেই জাপানি, চায়নিজ, জার্মানি কিংবা কানাডিয়ান হিলপরা আধুনিক মেয়েদের আমার ভালো লাগে না; আমার ভালো লাগে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে উড়ন্ত খোলা চুলে হেঁটে যাওয়া লাল পাড়ের নীল শাড়ি আর কপালে টিপপরা বাঙালি নারীকে।

গ্রীষ্মের সকালে ধানগাছের পাতার ওপর ছোট ছোট বিন্দু খুব ভালো লাগছে। শিশির ফোঁটাগুলো পাতার ওপর সারিবদ্ধভাবে বসে আছে। একটু বাতাসে হেলেদুলে যাওয়া ধানপাতার সঙ্গে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে। প্রতিটি শিশিরের ফোঁটা যেন মনে হচ্ছে একেকটি রুপায় খচিত নক্ষত্র। এত শিশির কীভাবে জমা হয়-আমি ভাবি। সূর্যরশ্মির প্রতিটি আলোয় যেন শিশির উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। প্রতিটি শিশির বিন্দু আমার খুব আপন মনে হয়। সব শিশিরকে যদি একসঙ্গে করে দেখা যেত। ধানের শিষের ওপর বিন্দু বিন্দু শিশির আজ ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। ধানখেতের পাশের কচুপাতার শিশির বিন্দু বিন্দু জমা হয়ে আছে। একটু নাড়া লাগলেই খসে পড়ে। শিশির বিন্দু তোমার কি কোনো স্থায়িত্ব নেই? তুমি কেন অল্পতেই ভেঙে পড়, গড়িয়ে পড়, লুটিয়ে পড়? তোমার নশ্বরতা আমাকে ভাবায়। আমি ভাবি, ক্ষয়ে যাওয়া জিনিসেই সুখ। যার ক্ষয় নেই, শেষ নেই, বিদায় নেই-তাকে আমার ভালো লাগে না। নশ্বরতা মানুষকে সুখ দেয়, আনন্দ দেয়। মানুষ ক্ষণিকের জন্য হলেও আবেগে মন খারাপ করে অথবা কান্নাকাটি করে। আমি জানি, এই শিশির বিন্দুগুলো আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। তাই কোনো আহ্বান নেই, সাড়া নেই, চেতনা নেই। তারপরও কেন আমি এই শিশিরকে এত ভালোবাসি?

মানুষের হয়তো বা অবিনশ্বর জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেশি। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নয়। আমি নশ্বর জিনিসকেই ভালোবাসতে চাই। নশ্বর জিনিসের মধ্যে একটি ভালো গুণ আছে। সে অপরকে স্থান করে দেয়। এই মুহূর্তটাই শুধু আমার। পরমুহূর্তটি আরেকজনের। সেজন্য বর্তমানকে নিয়ে খুশি থাকাটাই শ্রেয়। কারণ, আমরা নশ্বর। শিশির তুমি নশ্বর, সেজন্য তোমার প্রতি আমার এত ভালোবাসা! শিশিরের মধ্যে আরেকটি গুণ আছে। সেটি হচ্ছে, সে অপরের ওপর আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। কচুপাতার ওপরের শিশির বিন্দুগুলো রুপাসদৃশ মনে হলেও যখন সেই শিশির মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে সাধারণ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানি বলে মনে হয়। তখন তার কোনো রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই। পরকে আশ্রয় করে শিশির তুমি এত সুন্দর হও কেন? কচুপাতায়

কিংবা ধানখেতের ওপর তোমাকে এতটা স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ আর রুপার মতো লাগলেও, স্থান পরিবর্তন হলে কোথায় হারিয়ে যায় তোমার সেই গৌরব? শিশির তুমি যখন স্থান পরিবর্তন করে সাধারণ জলের মতো হয়ে যাও, তখন কি তুমি নিজেকে আলাদা করতে পার? নিশ্চয়ই না।

সেজন্য আমার মন চায়, আমি শিশিরের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হতে। চাই ধরাণকে অবলোকন করতে। আমার এই স্বচ্ছতা মানে নিজেকে সুসংগঠিত করা। সমাজের মধ্যে সৌন্দর্য বিকিরণ করা। নিরহংকার আর পরোপকারী মন নিয়ে পৃথিবীকে কিছু দিতে চাই। কারণ, আমি জানি, শিশিরের প্রস্থানের মতোই আমি যখন এই ধরণি থেকে বিদায় নেব, আমি হব অন্য সবার মতোই একজন। আমার কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে না। আমি নশ্বর।

বৈশাখের কালো মেঘ আর ঝড়ো হাওয়া মুহূর্তেই সব বদলে দিল। যে সকাল ছিল আলোয় ভরা, সেই সকাল এখন মেঘে আচ্ছাদিত। উত্তরে বয়ে চলা বৈশাখী এই ঝড়ো হাওয়া সবকিছু এলোমেলো করে দিল। বৃষ্টি অঝোরে ঝরছে। আকাশের সব মেঘমালা আজ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসছে। পৃথিবী নীরব এবং শুদ্ধ হয়ে গেল। গাছের ছোট ছোট আম আজ মার্বেল পাথরের মতো উঠোনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। বৃষ্টির ফোঁটায় একটি সৌন্দর্য আছে। টাপুর-টুপুর বৃষ্টির ফোঁটা যখন উঠোনের চলমান পানির ওপর পড়ে তখন বৃষ্টির ফোঁটাটি কয়েকগুণ বড় হয়ে ছাতার মতো ভেসে ওঠে। পরক্ষণেই আবার পানিতে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টির কাজ সবকিছু ধুয়ে-মুছে নদীতে ফেলে দেওয়া। সেই নদী একসময় সাগরে মিশে যায়। এই একখণ্ড ধূসর বর্ণের আকাশের মতোই হতে চাই। মেঘমালা হিমালয়ের গায়ে আঘাত করে ফিরে আসে তখনই বৃষ্টি হয়। বৈশাখীর এই বৃষ্টির মধ্যে এক ধরনের রুক্ষতা আছে। সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। প্রকৃতিকে নতুন করে সাজানোর জন্য এই রুক্ষতার প্রয়োজন। রুক্ষতার পরই প্রকৃতিতে সজীবতা ফিরে আসে। কান্না করলে আমরা যখন হালকা অনুভব করি, প্রকৃতিও তেমনি তার অজস্র মেঘমালাকে বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করে নিজেকে হালকা করে। আকাশ, মেঘমালা, বৃষ্টি, ধরণি আর প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক। নিজেদের ভারসাম্যের জন্যই এরা একেক সময় একেক রূপ ধারণ করে। বৈচিত্র্যময়তা এদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টির অঝোর ধারার মতো আমার বয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বহমান নদীর মতো বয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কাল, মহাকাল, শতাব্দী পেরিয়ে শুধু বয়ে যেতে মন চায়। বহমান নদীর মতোই আমিও এক সময় এই ধরণিতে বিচরণ করে মহাকালে মিশে যেতে চাই। অনাদি আর অনন্তকাল ধরে যেখানে শুধু শুরু আছে শেষ নেই। নদী যেমন সব আবর্জনা কিংবা নোংরা জিনিস আপন করে নিয়ে বয়ে যায়, আমিও পৃথিবীর সব গ্লানি আর অপমান বুকে করে চিরকাল বয়ে যেতে চাই। নদীর যেমন ক্লান্তি নেই, আমিও নদীর মতন ক্লান্তিহীন হতে চাই। নদী যেমন দু-পারের মানুষকে শুধু দিয়েই যায়, আমিও আমার চারপাশের মানুষকে শুধু দিয়েই যেতে চাই। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই সুখ। নিজের শ্রম, মেধা আর অর্থ-সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে হালকা হতে চাই। সুখী হতে চাই। গ্লানির বোঝা ধরণীতে

ফেলে অসীম পথে হাঁটতে চাই। একাকী এই হাঁটার মাঝেও সুখ আছে। অসীম অনন্তকাল ধরে হাঁটতে চাই। নদী যেমন সাগরে মিশে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করতে চায়, আমিও পরকালে গিয়ে মহাকালে হারিয়ে যেতে চাই। এই হারিয়ে যাওয়ার মাঝেই সুখ। পড়ন্ত বিকেলে বিশাল আকাশ যেমন আমার মনকে প্রসারিত করে, তেমনি মহাকালের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনও বিস্তৃত হয়। সব ভালো কাজ সঙ্গে নিয়ে গেলে মহাকাল হয়তো আমাকে ক্ষমা করে দেবে। আমিও হাঁটতে হাঁটতে দূরে-বহুদূরে মহাকালের সেই স্বর্ণকুটিরে আশ্রয় নিতে চাই। যেখানে অপার সুখ আর সুখ। মনের আনন্দে বিহঙ্গের মতো সেখানে বেড়াতে চাই। হাজার বছর ধরে অস্তিত্বের নিষ্পত্তি যেখানে, বিহঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর যাত্রা শুরু সেখানে। চলুক না এ যাত্রা অনন্তকাল ধরে!

কবর

জীব মাত্রই মরণশীল। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমার এই ছোট্ট জীবনে কাছের অনেকেই মারা গেছে। কারও জন্য লম্বা সময় খারাপ লাগেনি। আমার বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যু আমাকে ভীষণ কাঁদায়। দুটো মৃত্যুই দুর্ঘটনায়। বাংলাদেশের অনেক মানুষ গাড়ি/সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এগুলো প্রতিদিন খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় দেখি। কিছুটা মন খারাপ হলেও খুব একটা খারাপ লাগে না। কিন্তু আমার ভাই এবং বাবার কথা মনে পড়লে মনটা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে যায়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাদের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি আছে। এগুলো এখনো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। অন্য মানুষের মৃত্যু আমাকে বিচলিত না করলেও বাবা ও ভাই আমার নিকট আপনজন বলেই মনে হয় এত খারাপ লাগে। আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে বাঁশঝাড়ের নিচে তারা শায়িত। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যখনই যাই তখন শরীরটা শিহরিত হয়ে যায়। মনে হয়, কবর থেকে আমার বাবা আমাকে ডাকছেন আর ভাই সবকিছু দেখছেন। সাড়ে তিন হাত এই কবরের তেমন কোনো চিহ্ন নেই। চারপাশে ঝোপঝাড় আর অবহেলিত নানারকম জিনিসপত্রে ভরা। মৃত্যুর প্রথম দিনগুলোতে বাবা ও ভাইয়ের জন্য যেরকম খারাপ লাগত এখন আর সেরকম খারাপ লাগে না। অমাবস্যা রাতে যখন চারপাশের গাঢ় অন্ধকার আর জোনাকি পোকার মিটিমিটি আলো জ্বলে, তখন সেই ঝাড়ের ভেতর বয়ে যাওয়া শোঁ শোঁ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এই কবরের ভেতর তারা কেমন আছেন! খুব জানতে ইচ্ছা করে। কবরের পাশে গেলে অনেক সময় আমি থমকে দাঁড়াই। এত কাছের মানুষকেও কাছে থেকে দূরে রেখে ভাবতে হয়। জীবন জটিল। ভাবি, একদিন আমিও মরে যাব। এমন কোনো কবরে হয়তো আমিও শুয়ে থাকব। মুনকির ও নকির ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারব, হয়তো বা পারব না। এই পৃথিবীতে জীবনকে খুব তুচ্ছ মনে হয়। মৃত্যু যেখানে অনস্বীকার্য সেখানে এত লাফালাফি করে কী লাভ?

এই জন্যেই এই চাঁদনি রাতে গোপন অভিসারের কথা চাঁদ আর তারার সঙ্গে। চাঁদ আর তারা আমার খুব কাছের বন্ধু। আমার নিজের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। যেখানে শুধু আমি একাই ঘুরে বেড়াই। আমি ভাবি, একদিন আমি মরে যাব। সেই সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে আমাকে শায়িত করা হবে। ভালো-মন্দের বিচার হবে! ভাবি, শুধুই ভাবি। আমি চাই কোনো এক শুক্রবারে আমার মৃত্যু হোক। আমার কল্পনায় আমি চাই, সাদা কাফনের কাপড়ে আমার মৃতদেহটি জানাজা শেষে কবরে রেখে এলে ফেরেশতাদের সঙ্গে আমার একটা সখ্য গড়ে উঠুক। আমার কবরটি হোক কোনো একটি স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতালের মাঠে। আমি চাই কবরের চারপাশে নানারকম ফুল ফুটুক। ফুলের গন্ধে আমি ঘুমিয়ে থাকি। আমি চাই জ্যোৎস্নার আলোয় আমার কবর আলোকিত হোক। অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে জোনাকি পোকা যেন আমাকে আলো দেয়। পৃথিবীর কাউকেই আমার খুব আপন মনে হয় না। সবাই স্বার্থপর, হয়তো বা আমিও। এই স্বার্থপরতার মাঝেও আমি কিছু করে দিতে চাই। আমার সব অর্জন, জ্ঞান, বুদ্ধি আর অর্থ দিয়ে মানবসেবায় কিছু করে দিতে চাই। আমি চাই, আমার কিছু কন্ট্রিবিউশনের ভালো কাজের সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে আমার কবরে পৌঁছুক। কেউ না থাকলেও আমি চাই দূরের ওই আকাশ, জ্যোৎস্নার আলো, চাঁদ আর তারা আমার পাশে থাকুক। কবরে শুয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই। পৃথিবীর এই অট্টালিকা, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে সেই অসহায় মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখে দু-মুঠো অন্ন দিতে, তার একাকিত্বের অংশীদার হতে। শুনেছি, পৃথিবীতে মানসিকভাবে গরিব মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। আমি কি পারি না তাদের বন্ধু হতে। এই জবা, শিউলি, চামেলি, হাসনাহেনার গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে। আমি চাই এরা আমার সারা জীবনের বন্ধু হোক। গ্রামের শীতল ছায়া আর অবারিত মাঠ, ধানখেতের আলে বেড়ে ওঠা নাকফুলের মতো ঘাসফুল আমার খুব ভালো লাগে।

শালিকের জীবন আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি চাই আমি মরে গেলে এই শালিক, দোয়েল, টুনটুনি আমার কাছে থাক। ছোট্ট গোল্ডেন কালারের প্রজাপতিটি আমার কবরের ওপর ঘুরে বেড়াক। আমি চাই ঘাস ফড়িংটার সঙ্গে আমার কথা হোক। সমুদ্রের গর্জন আমি শুনতে না পেলেও আমি কোরআন আর হাদিসের তেলাওয়াত শুনতে চাই। আমি চাই পাঁচ ওয়াক্ত আজানের প্রতিধ্বনি আমার কবরে পৌঁছুক। আমি চাই বেলিফুল আর গোলাপের ঘ্রাণে আমার ঘুম ভাঙুক। আমি মরে গেলেও আমি বেঁচে থাকতে চাই এই এতিম, অনাথ, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন নারী, বয়সের ভারে ন্যুজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গ্রামের খেটে খাওয়া হাজারো অসহায় মানুষের ভিড়ে।